

মধ্য যুগের
মানব সভ্যতার ইতিহাস

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII Vide Notification T. B. No. VII/H/18/30 Dated 8.1.81

মধ্যযুগের মানব সভ্যতার ইতিহাস

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কুমার এম-এ. বি.টি.
(ডিপ্লোমা ইন বেসিক এডুকেশন) ডবলিউ. বি. ই. এস্. (অ)
ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (ভারত সরকার)
বারাসাত গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল, টাকী গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল ও
আড়াইডাঙ্গা ডি. বি. এম. অ্যাকাডেমী প্রভৃতি
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক।

রুমা
রুমা পাবলিকেশন
১৫এ, টেমার লেন • • • • কলিকাতা-৯।

প্রকাশক:
শ্রীসিদ্ধেশ্বর অধিকারী
১৫এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৮৫

মূল্য—বারো টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্যামলকান্তি কুমার
মিত্র প্রেস
২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ মধ্যযুগের শেষ পর্ব

প্রথম অধ্যায়	'মধ্যযুগ' কথার অর্থ মধ্যযুগের তাৎপর্য পুরাতন ও নতুন যুগের সমন্বয় যুগবিভাগের অসুবিধা

মধ্যযুগের তাৎপর্য

রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঃ রোমান সাম্রাজ্যের যুগে ইউরোপ গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠেছিল। বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। সেই সময়ই প্রাচীন যুগের অবসান হয় ও মধ্যযুগের সূচনা হয়।

মধ্যযুগের সূচনা ঃ বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে এই সময়ে ইউরোপে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ, বার্গাণ্ডিয়ান প্রভৃতি জার্মান জাতির লোকদের বর্বর জাতি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা অসভ্য ও বর্বর জাতি ছিল না। বহুদিন এরা রোমান সাম্রাজ্যে এসে বসবাসও করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই জার্মান জাতির লোকেরাই পশ্চিম ইউরোপে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এই রাজ্যগুলি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। নতুন আইন রচনা করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছিল অল্পদিনের মধ্যেই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ ভারতবর্ষেও প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। এর পর কিছুদিন শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠেনি। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতে ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা বা সামন্ত প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। এই সময় থেকে সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি বড় বড় জমিদার শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে দেশের ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ ও ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে শুরু করেছিল। তবে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই সাম্রাজ্য দুটি শক্তি হারাতে থাকে।

মধ্যযুগের স্থায়িত্ব কাল ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে পুরাতন যুগ প্রায় এক হাজার বছর ধরে স্থায়ী ছিল। মধ্যযুগের স্থায়িত্বও প্রায় এক হাজার বছর বা তার কিছু বেশী। মধ্যযুগের আরম্ভ হয়েছিল পঞ্চম শতাব্দী থেকে, আর শেষ হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর আবার ষোড়শ শতাব্দী থেকে নতুন বা আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। প্রাচীন যুগের পরে আর আধুনিক যুগের আগের সময়কেই মধ্যযুগ বা মাঝের যুগ বলা হয়। পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার ইতিহাসকে মধ্যযুগের ইতিহাস বলা হয়।

পুরাতন ও নতুন যুগের সমন্বয়

ইতিহাসের যুগবিভাগ সমীচীন নয় ঃ ইতিহাস হল মানব সভ্যতার ধারা। এই ধারা সব সময় এগিয়ে চলে। সভ্যতার ধারা হঠাৎ কোথাও থেমে যায় না; অথবা হঠাৎ কোন সময় আরম্ভও হয় না। উত্থান ও পতনের মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে যেমন অনেক সময় লেগেছিল, এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হতেও তেমনি অনেক সময় লেগেছিল। সব সভ্য দেশ সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। পুরাতন যুগের অবসানের যেমন কোন নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ দেওয়া যায় না, তেমনই নতুন যুগের আবির্ভাবেরও কোন নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়।

লেখক ও পাঠকের সুবিধা ঃ তা হলে পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার ইতিহাসকে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন ? মানব সভ্যতার ইতিহাস অতি বিশাল। যুগবিভাগ করে নিলে ইতিহাস পাঠের সুবিধা হয়। এইভাবে ভাগ করে নিলে ইতিহাস লেখারও অনেক সুবিধা হয়। একই সময়ে বসবাসকারী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ সম্বন্ধে জানার সুবিধা হয়। লেখক ও পাঠকের সুবিধার জন্যই যুগ ভাগ করে ইতিহাস লেখা হয়েছে।

পুরাতন সভ্যতার গুরুত্ব ঃ পুরাতনকে ভিত্তি করেই নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রাথমিক জ্ঞান লাভ না করে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা

যায় না। মধ্যযুগে যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা পুরাতন সভ্যতার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছিল। নতুন সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী সবই পুরাতন জ্ঞানের উপরেই ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। পুরাতনের ভিতরেই নতুন সভ্যতার বীজ নিহিত ছিল। প্রাচীন রোমান ও গ্রীক সভ্যতা কোন বিষয়ে হীন ছিল না। শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় রোমান ও গ্রীকগণ খুবই উন্নত ছিলেন। জার্মান জাতির আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রীক ও রোমানদের অজানা ছিল না।

জার্মান জাতির অবদান: তা ছাড়া জার্মান জাতির লোকেরা বর্বর ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই এঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা ঠিক করতেন। এদের মধ্যে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। রোমান জাতির লোকদের মধ্যে এঁরা নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা দান করেছিলেন। এইভাবে প্রাচীন ও নবীনের মিলনের মাধ্যমেই মধ্যযুগের নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

যুগবিভাগের অসুবিধা

সময়ের বিভিন্নতা: মানব সভ্যতার ইতিহাসের যুগ ভাগ করার নানা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, মধ্যযুগ পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে আরম্ভ হয়নি। ইউরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলিতে পঞ্চম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু চীন ও জাপানে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল অনেক পরে। আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত। এই দেশ দুটিতেও মধ্যযুগ বা সভ্যতার যুগ পঞ্চম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, সভ্যতার বিকাশেও এই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সব দেশে সমানভাবে উন্নত হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সব দেশ সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের যত প্রসার ঘটেছিল

অন্যান্য ধর্মের তেমন প্রসার ঘটেনি। জাতীয় ভাষার উন্নতিও মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সব ভাষাই মধ্যযুগে সমানভাবে উন্নত হয়নি। মধ্যযুগে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল; কিন্তু জনসাধারণ অর্থাৎ দরিদ্র, কৃষক, শ্রমিক ও চাষীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রচলন সব দেশে হয়নি। কোন কোন দেশে শিক্ষাকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল, আবার কোন কোন দেশে তা সম্ভব হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যও সব দেশে সমানভাবে উন্নত হয়নি।

তৃতীয়তঃ, মধ্যযুগের লোকেরা কখনও মনে করত না যে, তারা মধ্যযুগে বাস করছে। তাদের কাছে তাদের বাস করার সময় অর্থাৎ পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীই ছিল আধুনিক বা নতুন যুগ। হাজার বছর পরে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখা হলে সেটাকে মধ্যযুগ বা অন্য কোন নাম দেওয়া বিচিত্র নয়। এই সকল কারণে সভ্যতার ইতিহাসের যুগ ভাগে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগ বলতে কি বোঝ? ভারতে মধ্যযুগ কখন শুরু হয়েছিল?

২। ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা কখন হয়েছিল? এই যুগ কত দিন স্থায়ী হয়েছিল? সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। পঞ্চম শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কি বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে?

৪। পুরাতন ও নতুন যুগের সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে? উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা কর।

৫। যুগবিভাগ কাকে বলে? যুগবিভাগের স্থবিধা ও অসুবিধা কি?

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) কোন্ সময়ে ইউরোপ গৌরবের শিখরে উঠেছিল?

(খ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

(গ) 'মধ্যযুগের' স্থায়িত্বকাল কত?

(ঘ) জার্মান জাতির অবদান কি?

(ঙ) যুগবিভাগে ইতিহাস আলোচনায় সুবিধা হয় কিভাবে ?

(চ) চীন ও জাপানে মধ্যযুগ কখন শুরু হয়েছিল ?

৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়—আধুনিক যুগ / মধ্যযুগ।

(খ) যুগবিভাগ করলে ইতিহাস পাঠের—সুবিধা হয় / অসুবিধা হয়।

(গ) রোমান ও গ্রীকগণ স্থাপত্য ও শিল্পকলায়—উন্নত ছিল / অজ্ঞ ছিল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মানব সভ্যতার ইতিহাসে পুরাতন যুগ প্রায় — হাজার বছর ধরে স্থায়ী ছিল।

(খ) বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে — সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(গ) 'মধ্যযুগ' পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়ে — হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়	পাশ্চাত্যে মধ্যযুগের সূচনা জার্মান জাতির পশ্চিম ইউরোপ জয় জার্মান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন পশ্চিম ইউরোপে জার্মানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা

জার্মান জাতির পশ্চিম ইউরোপ জয়

হূণজাতি : হূণরা মঙ্গোলীয় জাতির যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকেরা পশ্চিম ইউরোপের নানা স্থানে লুটপাট ও নরহত্যা করে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এর কিছু পূর্বেই রোমান সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ, বার্গাণ্ডিয়ান প্রভৃতি জার্মান জাতির লোকেরা পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছিল।

হূণদের আক্রমণ : অস্ট্রোগথগণ এই সময়ে কৃষ্ণসাগরের তীরে বাস করছিল। হূণ আক্রমণ সবচেয়ে আগে এদের উপরেই এসে পড়ে। হূণদের ভয়ে ভীত হয়ে তারা ভিসিগথদের সাথে মিলিত হয়। ভিসিগথগণ এই সময় ডেসিয়া (Dacia) রাজ্যে বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। হূণবাহিনী এদের উপরও আক্রমণ শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে তারা ডানিউব নদী পার হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় চাইল। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট সব জার্মান জাতির লোককেই তাঁর সাম্রাজ্যে আশ্রয় দেবার সুযোগ দিলেন। এর ফলে হাজার হাজার জার্মান ডানিউব নদী পার হয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে গিয়েছিল ও অস্থায়ী রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

ভিসিগথগণ : ভিসিগথগণ প্রথমে নিম্নমোসিয়ায় রোমানদের মিত্র হিসাবে বাস করার অনুমতি চেয়েছিলেন ; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে রোমান শাসনকর্তাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অ্যাড্রিয়োনোপলের যুদ্ধে (৩৭৮ খ্রীঃ) তাঁরা রোমান সৈন্য-বাহিনীকে পরাজিত করেন। সম্রাট থিওডোসিয়াস এদের সাথে আবার সন্ধি করেন। তিনি ভিসিগথদের বাস করার জায়গা দিলেন ; রোমান সৈন্যবাহিনীতেও ভিসিগথদের নিয়োগ করলেন। কিন্তু

ভিসিগথগণ তাঁদের স্বাধীনতা হারালেন না। তাদের সুযোগ্য নেতা **অ্যালারিককেই** তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ করা হয়েছিল। কিন্তু থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর ভিসিগথদের সাথে রোমানদের আবার বিরোধ বাধল। অ্যালারিক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইতালী আক্রমণ করলেন। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ভিসিগথগণ রোম নগরে লুটপাট চালালেন। এর পর অ্যালারিক ভাল বাসস্থানের খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযান করেন। এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালারিকের মৃত্যু হলে, ভিসিগথদের নতুন নেতা, রোমানদের সাথে বন্ধুত্ব করে গল দেশে বাস করার অনুমতি পেয়েছিলেন।

ভাণ্ডালগণ—গাইসেরিকঃ ভাণ্ডাল জাতির নেতা ছিলেন **গাইসেরিক**। নানা স্থানে স্থায়ী বসবাস করার চেষ্টা করে তিনি বিফল হন। তাই ভাণ্ডালদের নিয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকা যাত্রা করেন ও সেখানে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যে গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম নগর লুণ্ঠন করেন। গাইসেরিকের মৃত্যুর পর তাদের আফ্রিকার সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

বার্গাণ্ডিয়ানঃ বার্গাণ্ডিয়ানগণ রাইন নদীর উপত্যকায় বাস করতে আরম্ভ করেছিল। নানা অসুবিধায় পড়ে তারা বেলজিয়ামের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু হূণদের সাথে যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় (৪৩৫ খ্রীঃ)। কোন শক্তিশালী রাজ্য গড়তে না পেরে তারা ফ্রাঙ্ক জাতির সাথে মিশে যায়।

অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুটঃ পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুট জাতির লোকেরা ব্রিটেন আক্রমণ করে। এখানকার প্রাচীন অধিবাসী কেল্টদের বিতাড়িত করে ব্রিটেনে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে।

ফ্রাঙ্ক জাতিঃ ফ্রাঙ্ক জাতির লোকেরা রাইন নদীর বামতীরে বসবাস করছিল। তাদের নেতা ছিলেন **ক্লোভিস**। ৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গলদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অ্যাটিলা ঃ ইতিমধ্যে হূণদের শেষ রাজা **অ্যাটিলা** প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে গলদেশ আক্রমণ করেন। এই বিপদের সময় রোমান ও জার্মানগণ মিলিত হয়ে তাঁকে ট্রইসের (Troyes) যুদ্ধে পরাজিত করেন। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটিলা ইতালী অভিযান করেন। পথে দুর্ভিক্ষে ও রোগে তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়। অবশেষে রোমের পোপ প্রথম লিও'র প্রভাবে তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে যান। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হলে পশ্চিম ইউরোপ হূণ আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঃ রোমান সম্রাটগণ ক্রমেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সৈন্যবাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময় পূর্ব রোমান সম্রাটের সাহায্যে জুলিয়াস নেপস নামে এক ব্যক্তি রোমের সিংহাসনে বসেন। তাঁরই এক কর্মচারী তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজ পুত্র রোমিউলাসকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। রোমান সৈন্যবাহিনীতে তীব্র অসন্তোষ চলছিল। এই সুযোগে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে **ওডোভাকার** নামে এক জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ রোমের সিংহাসন দখল করে। এইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য ও রোমান আইন প্রচলন ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও তাদের পূর্ব গৌরব নষ্ট হয়ে যায় নি। ওডোভাকার শুধু রোমের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। পূর্ব রোমান সম্রাটগণই রোমান সম্রাট বলে বিবেচিত হতেন। রাজ্যের সর্বত্র রোমান আইন প্রচলিত ছিল। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাও ক্রমে উন্নত হতে থাকে।

জার্মান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সকলের জীবনযাত্রা প্রণালী একই ধরনের ছিল না।

সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালী ঃ প্রাচীন কালে জার্মানগণ পরিবারভুক্ত হয়ে গ্রামেই বাস করতেন। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়-পরিজন নিয়ে তাঁরা ছোট ছোট বাড়ী তৈরি

করে বাস করতেন। কতকগুলি পরিবার মিলে গ্রাম গঠিত হত। কৃষি ও পশুপালনই এদের জীবিকা ছিল। গ্রামের কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ একত্রে চাষবাসের কাজ করতেন। আবাদযোগ্য জমির অর্ধেক অংশ এক বছরের জন্য পতিত রাখা হত। অপর অর্ধেক ভাগেই চাষবাস করা হত। পরের বছর আবার আগেকার পতিত জমিতে চাষ করা হত। ফসলের উৎপাদন বেশী হত না। জার্মানগণ খুব সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন। পুরুষগণ মাত্র একটি ঢিলা জামা পরতেন। মেয়েরা লিনেনের পোশাক পরতেন, এই পোশাকে লাল ফিতা বসান থাকত। হাতে কোন আবরণ থাকত না। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক ছিল না বললেই চলে। গ্রামে উৎসব আয়োজনও হত। উৎসবে ভোজই ছিল প্রধান বিষয়। ভোজসভায় জার্মানগণ নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। গ্রামের নেতাও এখানেই নির্বাচন করা হত। জার্মানগণ ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের যুদ্ধ করতে শেখাতেন। প্রাথমিক যুদ্ধবিদ্যা শেখা হয়ে গেলে কোন বড় নেতা, পিতা, অথবা কোন বয়স্ক ব্যক্তি যুবকদের হাতে ঢাল, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র দিতেন। এইভাবে তাদের যোদ্ধার জীবন শুরু হত। জার্মান বীরগণ তাদের নেতার আদেশ মেনে চলত। বড় বড় নেতাদের অধীনে আবার ছোট নেতা থাকতেন। এদের অধীনে সৈন্যগণ থাকতেন। অধীনস্থ নেতা ও সৈন্যগণ বড় নেতার হুকুম মেনে চলতেন। এইভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনুগামী সৈন্যদল সহ বড় যোদ্ধার দলকে 'কমিটেটাস' (The Comitatus) বলা হত। পরবর্তীকালে ইউরোপের ফিউডাল প্রথার উদ্ভবে এই প্রথার প্রভাব পড়েছিল।

রাজনৈতিক জীবনযাত্রার প্রণালী ঃ জার্মানগণ প্রাচীনকাল থেকেই স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকেই এদের ঝোঁক ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এদের মধ্যে আইনের প্রচলন ছিল। রোমান আইন থেকে এদের আইন অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। এই আইনগুলি লিখে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এক দলের কোন

লোক অপরাধ করলে সেই দলকেই ক্ষতিপূরণ করতে হত বা শাস্তি গ্রহণ করতে হত। পরবর্তীকালের জীবনযাত্রায় প্রাচীন আইনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশের পূর্বেই এদের গ্রাম সমাজ গড়ে উঠেছিল। গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রামের নেতার হাতে থাকত। গ্রামবাসীরাই নেতা নির্বাচন করতেন। এই রকম এক শত গ্রামপ্রধানরা বা যোদ্ধা নিয়ে দল তৈরী হত। একে বলা হত 'হাণ্ড্রেড'। কতকগুলি হাণ্ড্রেড নিয়ে ক্যাণ্টন বা শহরের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা হত। গ্রামের সভায় যেমন গ্রামের নেতা নির্বাচন করা হত, বড় বড় সভায় তেমনি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হত। যুদ্ধ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি বিস্তার, প্রধান নেতা বা রাজা নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় স্থির করা হত। খুব বড় যোদ্ধাকেই রাজার সম্মান দেওয়া হত।

ধর্মীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ঃ প্রাচীন জার্মানগণ প্রাকৃতিক শক্তি-গুলিকেই দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করতেন। এঁদের মধ্যে পুরোহিত সম্প্রদায়ও ছিলেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় শ্রেণীর পুরোহিত থাকতেন। বৃক্ষলতাপূর্ণ কোন সুন্দর স্থান বা কোন বিশেষ গাছের নীচেই পূজা করার প্রথা ছিল। মন্দির ও পূজার বেদীও কোন কোন স্থানে ছিল। পশুবলির প্রথাও ছিল। জার্মান দেবদেবীর সংখ্যাও কম ছিল না। বজ্রের দেবতা ছিলেন 'থর' (Thor)। রথে চড়ে পৃথিবী রক্ষা করা ছিল এঁর কাজ। 'ওডেন' (Woden) ছিলেন ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক) ও কবিতার দেবতা। নরকের দেবতার নাম 'ওয়াল্লা' (Lord of Walla); এঁর স্ত্রীর নাম ফ্রিগ্গা। ইনি বিবাহ ও পরিবারের দেবী ছিলেন। এই সকল দেবদেবীর নাম থেকেই সম্ভবতঃ ইংরাজী বারের নাম প্রচলিত হয়েছে। যেমন 'থর' থেকে হয়েছে থার্সডে (Thor = Thursday)। ওডেন থেকে ওয়েন্সডে (Woden = Wednesday)। ফ্রিগ্গা থেকে ফ্রাইডে (Frigga = Friday) ইত্যাদি। রোম সাম্রাজ্যে এসে অনেকদিন বাস করার ফলে এদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম ইউরোপে জার্মান জাতির রাজ্য প্রতিষ্ঠা

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে কিছু দিন অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তারপরই জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

ফ্রান্স: এই নতুন রাজ্যগুলির মধ্যে ফ্রান্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্রাঙ্কগণ খুব শক্তিশালী ছিলেন। তাঁদের নেতা ক্লোভিসের নাম আগেই বলা হয়েছে। ৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড জয় করে তিনি রাজ্যের সীমা আরও বাড়িয়েছিলেন। ৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও দেশবাসীকেও এই ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। খ্রীষ্টান-যাজকরা তাঁকে রাজ্য বিস্তারে ও রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। দেশে নতুন আইন প্রণয়ন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মেরোভিঞ্জি রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ।

ইতালী: অস্ট্রোগথগণ ইতালীতে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অস্ট্রোগথ নেতা থিওডোরিক ৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালীতে রাজত্ব করেছিলেন। সমগ্র রাজ্যে রোমান আইনের প্রচলন ও রোমান প্রথায় দেশের শাসনকার্য পরিচালনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। নিজে রোমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করলেও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের উপর তিনি সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁর রাজত্ব কালে বোয়েথিয়াস (৪৮০-৫২৫ খ্রীঃ) নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটলের দর্শন, ইউক্লিড ও আর্কিমিডাসের বিজ্ঞানের বইগুলি অনুবাদ করেছিলেন।

লোম্বার্ড রাজ্য: লোম্বার্ডদের নেতা আলবিয়ন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রোম নগরের কাছে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে শুধু রোম নগর ছাড়া পশ্চিম ইউরোপে পোপের আর বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না।

স্পেন ও পর্তুগাল: ভিসিগথদের নেতা ইউরিক স্পেন ও

পর্তুগালে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি রোমান প্রথায় রাজ্য শাসনব্যবস্থা করেছিলেন ও দেশের সর্বত্র রোমান আইনের প্রচলন করেছিলেন। এই রাজ্য বেশীদিন টিকে থাকেনি।

ব্রিটেন: অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুটদের ব্রিটেনে আসার কথা আগেই বলা হয়েছে। অ্যাঙ্গলরা দক্ষিণ-পূর্ব ব্রিটেনে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার নামই পরে ইংলণ্ড হয়েছিল। জুটেরা কেন্ট প্রদেশে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের নেতার নাম ছিল হেনজিস্ট ও হোরসা। সপ্তম শতাব্দীতে ব্রিটেনে ছোট ছোট সাতটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ব্রিটেনে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এগবার্ট নামে এক রাজা সমগ্র রাজ্যের ঐক্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা আলফ্রেড সমগ্র ব্রিটেনে তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন।

সাধারণের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব: পঞ্চম শতাব্দী থেকে পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয়েছিল। দেশের জনসাধারণের উপর খ্রীষ্টধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে দেশের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশে আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে তা অনেকটা ফিরে এসেছিল। রোমের পোপ ছিলেন খুব সম্মানিত ব্যক্তি। দেশের বড় বড় সহর ও গ্রামে গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ন্যায়নীতি ও শান্তির বাণী প্রচারের ফলে দেশের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল; অত্যাচার অবিচারও অনেক কমে গিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। হূণরা কে? এরা কি করেছিল? হূণ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। রোম নগর কিভাবে এবং কেন লুণ্ঠিত হয়েছিল? ভিসিগথদের সাথে রোমানদের কি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

৩। অ্যালারিক কে ছিলেন? তিনি কোন্ দেশ আক্রমণ করেছিলেন? তার ফল কি হয়েছিল?

৪। গাইসেরিক কাদের নেতা ছিলেন? তাঁর কর্মপদ্ধতির বিবরণ দাও।

৫। রোমান সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে হয়েছিল? রোমান আইন ও রোমান ভাবধারায় প্রচলনের বিষয় যা জান লেখ।

৬। জার্মান জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও।

৭। রোমান জাতির ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৮। রোমানদের প্রধান দেবদেবীর বিবরণ দাও।

৯। পশ্চিম ইউরোপে জার্মান জাতি কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল?

১০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) কমিটেটাস কাদের বলা হয়?

(খ) অ্যাটিলা কে ছিলেন? তিনি কোন্ দেশ অভিযান করেছিলেন?

(গ) বার্গাণ্ডিয়ানগণ কোথায় বসবাস করত?

(ঘ) পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব কি রকম ছিল?

১১। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) অ্যালারিক ছিলেন একজন—ধর্মযাজক/সৈন্যাধ্যক্ষ।

(খ) ভাণ্ডাল জাতির নেতা ছিলেন—গাইসেরিক/অ্যাটিলা।

(গ) অস্ট্রোগথগণ তাদের রাজ্য স্থাপন করেছিল—ফ্রান্সে/ইতালিতে।

(ঘ) বোয়েথিয়াস ছিলেন একজন—সঙ্গীত শিল্পী/পণ্ডিত।

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হূণরা — গোষ্ঠীর লোক।

(খ) জার্মানদের বজ্রের দেবতাকে — — বলা হত।

(গ) মেরোভিঞ্জি একটি — বংশের নাম।

তৃতীয় অধ্যায়	ইউরোপে অন্ধকার যুগের প্রভাব মধ্যযুগের আদি পর্বে ইউরোপের অবস্থা আদিপর্বের শিক্ষাব্যবস্থা আদিপর্বের সামাজিক অবস্থা

মধ্যযুগের আদিপর্বে ইউরোপের অবস্থা

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের কল্পনা ঃ মধ্যযুগের আদি পর্ব বা গোড়ার দিকে, চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ইতিহাস লেখকগণ ইউরোপের "অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ" বা "ডার্ক এজ" বলে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা প্রবাদে পরিণত হয়েছে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

এই কল্পনার কারণ ঃ কোন দেশের ইতিহাস জানতে হলে, সেই সময়কার লেখা ইতিহাসের বই পড়তে হয়। পর্যটকদের বিবরণের মাধ্যমেও কোন দেশের কোন বিশেষ সময়ের অবস্থা জানা যায়। চতুর্থ শতাব্দা থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লেখা ইতিহাসের পুস্তক নেই বললেই চলে। সেই সময়কার ভ্রমণকারীর লিখিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই বোধ হয় এই প্রবাদ বা কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন গবেষণা ঃ বর্তমান কালের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে, এই সময়ে অনেক মনীষী ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল, অনেক ভাল প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পুস্তক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই বইগুলি থেকে বর্তমান কালেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। মধ্যযুগে যে সৌধ-গুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলিও কম বিখ্যাত নয়। এই সময় জাতীয় ভাষায় অনেক কবিতা, গল্প, উপদেশ ও প্রার্থনা লিখিত হয়েছিল।

একথা অবশ্য মানতে হবে যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বর্বর জাতির আক্রমণ চলেছিল অনেক দিন ধরে। এই সময়ে খুব উঁচু ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার আশা করা যায় না

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা ও নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার উদ্যমের অভাব এই সময় হয়নি।

রাজনৈতিক অবস্থা : রোমানদের হাত থেকে রাজ্য শাসনক্ষমতা এসে পড়েছিল জার্মান জাতির লোকের হাতে। সাম্রাজ্য শাসন ব্যাপারে এতে পরিবর্তন খুব কমই হয়েছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিম ইউরোপে যে নতুন রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির রাজারা রোমান আইন, রোমান সভ্যতা ও রোমান প্রণালীতে রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কোন কোন রাজা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে প্রজাদের এই ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। রোমান অভিজাত বংশের লোক অনেক রাজ্যের মন্ত্রীর পদও গ্রহণ করে-ছিলেন। রোমান ও জার্মান উভয় সম্প্রদায় মিলে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। কোন স্থানেই অরাজকতা দেখা দেয়নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়নি। সে সময়ে অনেক ভাল ভাল বইও লিখিত হয়েছিল। সুতরাং জার্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল একথা বলার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আদিপর্বের শিক্ষাব্যবস্থা

মধ্যযুগের আদিপর্বে অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার খুব উন্নতি হয় নি। রোমান আমলের বিদ্যালয়গুলি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত বিদ্যালয়গুলি টিকে ছিল।

গির্জার শিক্ষাব্যবস্থা : এই সময়ে দেশের শাসনভার জার্মানদের হাত হতে চলে গেলেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাঁরা হাত দেন নি। রোমের পোপ ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতেও গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গ্রামগুলিও

বাদ দেওয়া হয় নি। সেখানেও গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গির্জার ধর্মযাজক হতে হলে লেখাপড়া শিখতে হত। তাই সব গির্জার সাথেই বিদ্যালয় থাকতো। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন রোমান প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হত।

মঠের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ এই যুগে পশ্চিম ইউরোপে অনেক মনাস্ট্রি (Monastery) বা মঠ স্থাপিত হয়েছিল। রাজ্যের রাজা ও ধনী লোকদের দানেই মঠ গড়ে উঠেছিল। মঠের সন্ন্যাসীগণের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও জ্ঞান জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সকল মঠের সাথেই বিদ্যালয় সংলগ্ন থাকত। এখানে প্রাচীন পুস্তকগুলি রক্ষা করা হত। মঠের বিদ্যালয়গুলিতে মঠের সন্ন্যাসী ও বাইরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাধু বেনিডিক্ট ইউরোপে প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাসিডোরাস্ নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি মঠের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহদাতা ছিলেন। সাধু বনিফিস (St. Bonifice) এই সময়কার শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহদাতা ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বীডের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বয়েথিয়াস (Boethius) শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা সারা ব্রিটেনে খ্রীষ্টান ভাবধারা প্রচার করেছিলেন।

জাতীয় ভাষা ও গ্রন্থ ঃ জাতীয় ভাষায়ও কিছু কিছু বই লিখিত হয়েছিল। গির্জা ও মঠের বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। স্থানীয় ভাষাতেও পাঠ্য পুস্তক, গল্পের বই ও কবিতা লেখা হয়েছিল। বয়েথিয়াস অ্যারিস্টটলের ও প্লেটোর বইগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেভাইলের বিশপ ইসিডোর (৬০০— ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ ; Isidore of Sevile) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়গুলি একত্রিত করে ইটিমলজি (Etymology) নামে একটি বই লিখেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় বিওউল্‌ফ (Beowulf) কাব্য ও কেড্‌ম্যান (Caedman) কবিতার বই লিখেছিলেন অনেক আগেই।

মধ্যযুগের আদিপর্বে সামাজিক অবস্থা

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঃ— পঞ্চম শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক জীবনে গির্জার প্রভাব পড়েছিল। রোমের পোপ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান ছিলেন। বড় বড় শহর থেকে শুরু করে ছোট ছোট গ্রামেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যে অনেক ভাল রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না। এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দেশের রাজা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায়, দেশের লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গির্জার প্রার্থনা সভায় যোগদান করা সকল খ্রীষ্টানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই সভায় বাইবেল থেকেই উপদেশ দেওয়া হত। বাইবেলের উপদেশ হল,—কোন অন্যায় আচরণ না করা, গরীবকে সাহায্য করা ও পীড়িত ব্যক্তির সেবা করা।

খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ ঃ খ্রীষ্টধর্ম পরকালের জীবনের উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করে। বর্তমান জীবন পরকালের অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের প্রস্তুতি মাত্র। ভাল খ্রীষ্টান হতে হলে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে হত। এর ফলে জনসাধারণের নৈতিক জীবন উন্নত হয়েছিল। প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করাও খ্রীষ্টানদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত হয়েছিল ও সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল।

শাস্তি ঃ খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হওয়ায় রাজার কাছ থেকে বিশপ, আর্চবিশপগণ তাঁদের পদের স্বীকৃতি পেতেন। তাই সমাজের লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি। অনেক সময় ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া বৈষয়িক ব্যাপারে বিচারের ভারও তাঁদের হাতেই এসে পড়েছিল। ধর্মীয় অন্যায়-আচরণের বিচার-ব্যবস্থা খুব কঠিন ছিল। এর জন্য অনুতাপ, উপবাস, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি শাস্তি বিধান ছিল। অপরাধ গুরুতর হলে খ্রীষ্টান সমাজ থেকে বহিষ্কার করার অধিকারও ধর্মযাজকদের হাতেই ছিল।

অনুশীলনী

১। ইউরোপের কোন্ সময়কে 'অন্ধকারময় যুগ' বলা হয়? এর কারণ কি? বর্তমানে এই ধারণার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে?

২। মধ্যযুগের আদিপর্বে ইউরোপে শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন ছিল? সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। গির্জার শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ কি? এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে কিভাবে শিক্ষাদান করা হত?

৪। মধ্যযুগের আদিপর্বে ইউরোপের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) মধ্যযুগের আদিপর্বে ইউরোপের রাজ্য শাসনক্ষমতা কারা পেয়েছিল?

(খ) মধ্যযুগের আদিপর্বে শিক্ষাব্যবস্থায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব কি ছিল?

(গ) খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হওয়ার কি ফল হল?

৬। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও:

(ক) ইউরোপের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' কথাটি—ঠিক নয়/খুবই সত্যি।

(খ) ইউরোপে আদিপর্বে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল—গির্জা কেন্দ্রিক/বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক।

(গ) ক্যাসিডোরাস্ ছিলেন একজন—পণ্ডিত ব্যক্তি/প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) গির্জার বিদ্যালয়গুলি থেকে প্রাচীন — প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হত।

(খ) সাধু বনিফিস একজন প্রখ্যাত — অনুরাগী ছিলেন।

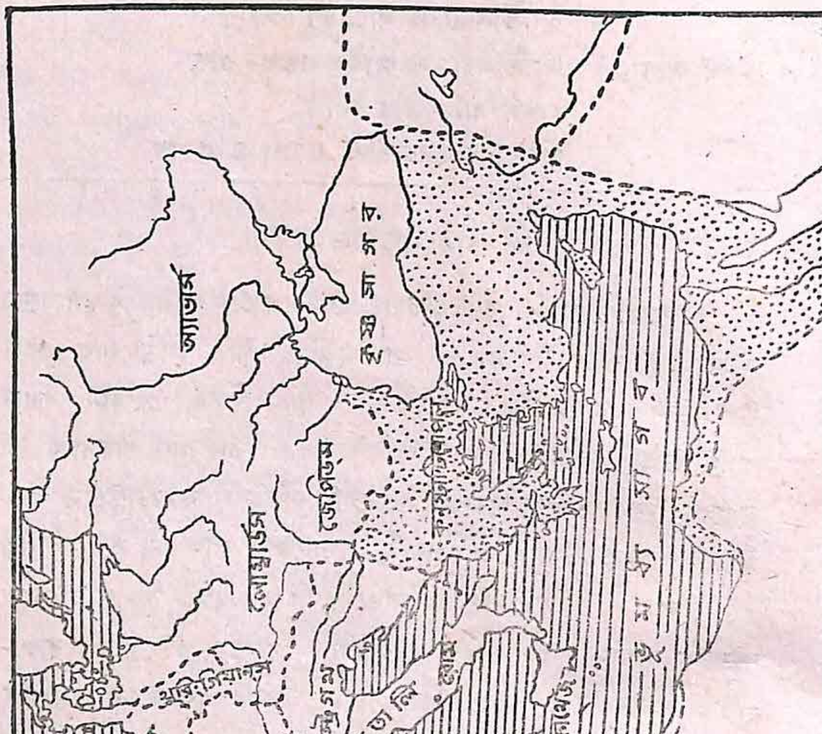
(গ) মধ্যযুগের আদিপর্বে গির্জার বিদ্যালয়ে—ভাষায় শিক্ষাদান হত।

চতুর্থ অধ্যায়	বাইজেণ্টাইন সভ্যতা জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার জাস্টিনিয়ানের আইন সঙ্কলন গ্রন্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের রক্ষা ব্যবস্থা ও প্রসার

ক বাইজেণ্টাইন সভ্যতা

বাইজেণ্টিয়াম ঃ বাইজেন্টিয়াম একটি প্রাচীন স্থান। কৃষ্ণসাগরের তীরে এই স্থান অবস্থিত। প্রাচীনকালে গ্রীক সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ এখানে গড়ে উঠেছিল। এই স্থানে রোমান সম্রাট কনস্টাণ্টাইন একটি নগর তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই নগরের নাম দেওয়া হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। কনস্টাণ্টাইন ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্য পতনের কিছু আগেই দুটি স্থান থেকে সাম্রাজ্য শাসন করা আরম্ভ হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলির শাসনকার্যের কেন্দ্র ছিল রোম; আর পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি শাসন করা হত কনস্টান্টিনোপল থেকে। রাজধানী এখানে আসায় স্থানটির গৌরব বেড়ে গিয়েছিল; নগরের অনেক উন্নতিও হয়েছিল। কনস্টাণ্টাইনের পর আরও অনেক সুযোগ্য সম্রাট এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। এখানে শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও ঘটেছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ফলে গ্রীক, রোমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতা মিলে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই নতুন সভ্যতাকে বাইজেণ্টাইন সভ্যতা বলে।

রোমান সাম্রাজ্যে অনেক দিন আগে থেকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। রোমান সম্রাটগণ প্রথম দিকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। ধর্মপ্রচারকগণ অনেক সময় সম্রাটগণ কর্তৃক নির্যাতিত হতেন। কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক আদেশ প্রচার করে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার বন্ধ করা হয় ও খ্রীষ্টধর্মকে অন্যান্য ধর্মের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়।


আটলান্টিক মহাসাগর
অ্যাভার্স
লোম্বার্ডস
জেপিডস্
কৃষ্ণ সাগর
ফ্রাঙ্কস্
প্যারিস
বারগুনডিয়ান
অস্ট্রগথ
ইতালি
রোম
কনস্টান্টিনোপল
ভিজিগথ
সুয়েভস্
ভ্যান্ডাল
কার্থেজ
ভূমধ্য সাগর
রোম সাম্রাজ্য
রোম সাম্রাজ্যের বিভক্তি;
রোম ও কনস্টান্টিনোপল

জীবনের শেষের দিকে মৃত্যুশয্যায় সম্রাট কনস্টাণ্টাইন নিজেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথা অনুসারে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রধান বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মস্থান বা গির্জাগুলি রক্ষা করার ভারও তাঁর উপরেই এসে পড়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল। এখন তিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তাঁর নাম হল মহান রাজা কনস্টাণ্টাইন। খ্রীষ্টধর্ম সমগ্র রাজ্যের ধর্ম বলে বিবেচিত হল। অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের সাথে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণও রাজার দরবারে আসতে লাগলেন; তাঁরাও অনেক উচ্চ রাজপদ লাভ করতে লাগলেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন রাজদরবারে ও মুদ্রায় অঙ্কিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ এই সময় থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁদের উপর কর বসান বন্ধ করা হয়েছিল। এই সময় খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঘটেছিল। দলে দলে দেশের লোক এই ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। গির্জা ও মঠেরও বিভিন্ন রকম উন্নতি করা হয়েছিল। ধনী ব্যক্তিগণ গির্জা ও মঠে অনেক ধনসম্পত্তি দান করতে আরম্ভ করেছিলেন। কনস্টাণ্টাইনের মৃত্যুর পর অন্যান্য ধর্মের লোকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল ও কিছু দিনের মধ্যেই এদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল।

জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার (৫২৭-৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)

জাস্টিনিয়ান ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তিনি একজন সুযোগ্য নৃপতি ছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার, আইন প্রণয়ন ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপে বাইজেন্টাইন সম্রাটদের মধ্যে তাঁর স্থান অনেক উপরে ছিল। তাঁর চরিত্রে পরস্পরবিরোধী নানা গুণ ও দোষের সমাবেশ ঘটেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সংগঠন ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি নানা গুণের অধিকারী হলেও মাঝে মাঝে হঠকারিতা ও নিষ্ঠুরতা দেখাতে তিনি ত্রুটি

করেন নি। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর স্ত্রী থিয়োডোরার প্রভাবের ফলে তাঁকে অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়েছিল।



জাস্টিনিয়ান

রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজশক্তির দুর্বলতার জন্য পশ্চিম ইউরোপ রোমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে,—এই ছিল তাঁর ধারণা। দেশ থেকে বর্বর জার্মানদের বিতাড়িত করে রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই কাজে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। এইজন্য তাঁকে 'শেষ রোমান সম্রাট' বলা হয়।

রাজ্য জয়ঃ জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলসেরিয়াস অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সাহায্যেই জাস্টিনিয়ানের বিজয় অভিযান অনেকটা সফল হয়েছিল। পারস্যরাজ খসরুর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান চালিয়ে তিনি পারস্য দেশ জয় করেছিলেন। এরপর ভাণ্ডালদের পরাজিত করে ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্থেজ জয় করেছিলেন। তারপর জাস্টিনিয়ান ইতালী জয় করতে মনস্থ করেছিলেন। বেলিসিরিয়াস একদল সৈন্যসহ ইতালী যাত্রা করেন ও ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিনা বাধায় রোম ও নেপলস অধিকার করেন; কিন্তু ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্পূর্ণ ইতালী জয় করা সম্ভব হয়নি। স্পেনের উপকূলের স্থানগুলি ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলিও তাঁর অধীনে এসেছিল। এই সময় পারসিকগণ আর্মেনিয়া আক্রমণ করলে জাস্টিনিয়ান বেলিসেরিয়াসকে পারস্যে পাঠাতে বাধ্য হন। এই সুযোগে ইতালীতে গোলমাল বেধে যায়। অস্ট্রোগথগণ ইতালীর অনেক স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। তা হলেও রোমান সাম্রাজ্যের অধিকৃত খুব দূরের দেশগুলি ছাড়া প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সবটুকুই তিনি

অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন রোমান সম্রাট ছিলেন।

বিজয় অভিযানের ফলাফল : জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইতালীর সাম্রাজ্য উদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান ইচ্ছা ; তাই পারস্যের বিজিত অঞ্চলগুলি সুরক্ষিত না করেই তিনি ইতালী অধিকারের দিকে মন দিয়েছিলেন। এর ফলে পারস্যের অনেক স্থান তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ পারস্য জয় করে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণসাগর ও পূর্বদিকে বাণিজ্যপথ তাঁর অধিকারেই ছিল। ইতালীতেও ছোট ছোট অনেক রাজ্য গড়ে উঠেছিল ; শুধু দক্ষিণ ইতালী প্রায় পাঁচশ' বছর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জাস্টিনিয়ানের আইন সঙ্কলন গ্রন্থ

রাজ্য বিজয় অপেক্ষা আইন প্রণয়নের জন্যই জাস্টিনিয়ান বেশী খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা এর জন্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে আইনের অবস্থা : সিংহাসনে বসার পরেই দেশের আইন-শৃঙ্খলার উপর তিনি নজর দিয়েছিলেন। বাইজেন্টিয়ামের নতুন সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন রোমান আইনগুলি প্রয়োগ করার অনেক অসুবিধা ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে দেশের সব লোকের নাগরিক অধিকার ছিল না। অন্যান্য জাতির লোকের জন্য পৃথক আইন ছিল। তা ছাড়া অনাগরিক ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য বিচারকগণ প্রচলিত দেশীয় আইন অনুসারে বিচার করতে বাধ্য হতেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ফলে দেশের সামাজিক অবস্থা পাল্‌টে গিয়েছিল। নাগরিক অধিকার সকলেই পেয়েছিল। সেকালে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ আইনের চোখে সকল ব্যক্তিই সমান—এই ভাবধারা আইন প্রণয়নের অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস

অনেক আগেই দেশের আইন সংস্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

আইন কমিশন ঃ মন্ত্রী ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে দেশের বিশিষ্ট আইনবিদ্‌দের নিয়ে এক কমিশন বা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই পরিষদের উপর নতুন আইনের সংকলনের ভার দেওয়া হয়েছিল। দু'বছরের মধ্যেই এই পরিষদ আইন কোড প্রকাশ করেছিলেন। এই কোডে প্রাচীনকাল থেকে জাস্টিনিয়ানের সময় পর্যন্ত রোমান সম্রাটগণ যত আইন তৈরি করেছেন সবই ছিল। এর পর আইন কমিশন আর একটি আইন বই লিখেছিলেন। এর নাম ডাইজেস্ট। এই পুস্তকে আইনগুলির ভাষ্য বা বিশদভাবে অর্থ দেওয়া হয়েছে। এতেও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। কিছু আইন সে সময়ের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না। এইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বই মিলিয়ে একটি নতুন বই রচিত হল। এর নাম ইনস্টিটিউট্‌স্‌। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এই বই লেখা হয়েছিল। এই তিনটি বই ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এর পর গ্রীক ভাষায় আইনের একটি বই লেখা হয়েছিল। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও তাঁর কিছু পরে যাঁরা সম্রাট হয়েছিলেন তাঁদের সময়কার আইনগুলি এই পুস্তকে স্থান পেয়েছিল। এর নাম নভেল। কোড, ডাইজেস্ট, ইনস্টিটিউট্‌স্‌ ও নভেল এই চারটি ভাগ একত্র করেই জাস্টিনিয়ানের প্রসিদ্ধ আইন কোড বা সঙ্কলন আইন প্রকাশিত হয়েছিল।

আইন কোডের গুরুত্ব ঃ জাস্টিনিয়ানের আমলে রোমান সাম্রাজ্যের আইনগুলি লিখিত ও প্রকাশিত হওয়ায় ধ্বংসের হাত থেকে এগুলি রক্ষা পেয়েছিল। তা ছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের সে কালের অবস্থার কথাও এ পুস্তকে আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি দেশের আইন রচনার ভিত্তি হিসাবে এই আইন পুস্তকের গুরুত্ব কম নয়। তৃতীয়তঃ, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে প্রাচীন রোমান আইনগুলি কি ভাবে নমনীয় ও উদার হয়েছিল তাও এই পুস্তকে দেখা যায়।

চতুর্থতঃ, বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক আইন বা সব দেশের লোকের জন্য প্রযোজ্য আইনের বীজও এই আইন গ্রন্থে আছে। এছাড়া মধ্যযুগের রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং দেশের সব সম্পত্তির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই আইনগুলি অনেক সাহায্য করেছিল।

স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ জাস্টিনিয়ানের সময়কে স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর সময়ে দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ, গির্জা ও মঠ গড়ে উঠেছিল। চিত্রশিল্পিগণও নানা চিত্র এঁকে মঠ ও গির্জার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সময়ে নির্মিত সান্টাসোফিয়া গির্জা স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্যের অমূল্য নিদর্শন। বহু অর্থব্যয় করে পাঁচ বছরে এই গির্জা নির্মিত হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য এর গম্বুজ। মেঝে থেকে গম্বুজ ১৭৯ ফুট উঁচু। কোন কড়ি-বরগা ছাড়াই শুধু খিলানের সাহায্যে এই গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। এই গির্জার দেওয়ালগুলিতে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে। গির্জার মেঝে নানা রঙের মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ গির্জা ও মঠ নির্মিত হয়েছিল ও নানা চিত্র শোভিত করা হয়েছিল। বিদেশে বিশেষ করে আরবদেশে এই স্থাপত্যের অনুকরণে অনেক মসজিদ তৈরী হয়েছিল। গ্রীক, রোমান ও খ্রীষ্টান শিল্পের সংমিশ্রণে এই নতুন স্থাপত্য শিল্পকে বাইজেন্টাইন স্থাপত্য শিল্প বলে।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার প্রভাব

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঃ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময় থেকে প্রথম ধর্মযুদ্ধ পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে নানা বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল। দেশের উন্নতির মূলে ছিল এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি। এর ফলে সাম্রাজ্যের আয় বেড়ে গিয়েছিল। সেইজন্য এখানকার সম্রাটগণ স্থাপত্য শিল্প, চিত্র শিল্প ও শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি করতে পেরেছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের প্রধান কারণ এখানকার সম্রাটদের হাতের অসীম ক্ষমতা। রাজার ক্ষমতার ফলে দেশের শাসন-শৃঙ্খলার উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল। সম্রাটগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে কোন বৈদেশিক আক্রমণ এদেশে হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বাইজেন্টিয়াম প্রাচীন কাল থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দেশের যোগাযোগের স্থান ছিল। এই দেশের ভিতর দিয়েই পূর্ব ও পশ্চিম দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্যপথ এসে মিলিত হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল সেকালের সমৃদ্ধ শহর ছিল। এখানকার লোকসংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল, জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছিল। জীবনধারণের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত। কনস্টান্টিনোপল সেকালের বিখ্যাত বন্দর ছিল।

সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আলেকজাণ্ড্রিয়া, পারস্য, স্কাণ্ডিনেভিয়া, ভেনিস প্রভৃতি দেশ থেকে নানা ব্যবসা-বাণিজ্যের জিনিস বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে আসতো ও এখান থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চালান যেত। জিনিসগুলির উপর বাণিজ্য-কর আদায় করা হত। কনস্টান্টিনোপল থেকে বাইজেন্টাইন জাহাজগুলি বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বসফরাসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়ত, আর ডার্ডানালেসের মধ্য দিয়ে ইজিয়ান সাগরে পড়ত ও সেই পথে নানা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময়েই গুটিপোকার উৎপাদন ও রেশমের কাপড় এখানকার কারখানাগুলিতে তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল। ইতালীতে রেশমের কাপড় তৈরী হবার আগে পর্যন্ত বাইজেন্টিয়ামের রেশমের কাপড় বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হত। নানা সোনা-রূপার অলঙ্কার তৈরির কাজে বাইজেন্টাইন শিল্পিগণ খুব উন্নত হয়েছিলেন। অলঙ্কারগুলিতে নানা মূল্যবান পাথর বসান থাকত। সেগুলিও সে সময়কার সভ্য দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। এই ভাবে বাইজেন্টিয়াম এক প্রসিদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি রক্ষার ব্যবস্থা ঃ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথিগুলি বাঁচিয়ে রাখার কাজে বাইজেন্টাইন সাম্রাজের ভূমিকা কম নয়। বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপে রোমান ও গ্রীক সাহিত্য, নাটক, দর্শনের প্রাচীন বইগুলি সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার (১৪৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত এই দেশে প্রাচীন পুঁথিগুলি ধ্বংস হয় নি। প্রাচীন পুঁথিগুলি এরা নকল করে রেখেছিল ও নিজেরাও অনেক বই লিখেছিল। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর পণ্ডিতগণ তাদের পুরাতন বইগুলি নিয়ে ইতালিতে পালিয়ে যান। এই বইগুলির মধ্যে গ্রীক ভাষায় লিখিত প্রাচীন বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট (New Testamemt), দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিদ্যা, জ্যোতিষ ও সাহিত্যের বইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইজেন্টিয়াম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠগুলিতে এই বইগুলি নকল করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস কনস্টান্টি-নোপলে একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রের সাথে গ্রন্থাগারও ছিল। ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে এই বইগুলি খুব কাজে লেগেছিল। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের (১৪৪০ খ্রীঃ) ফলে এই বইগুলি ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। প্রাচীন বইগুলিতে রেনেসাঁর সময়কার মানবিক শিক্ষার সমর্থন ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঃ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে খ্রীষ্টধর্মের লোকদের সাথে কোন বিরোধ ছিল না। পশ্চিম ইউরোপে এগুলিকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করা হত ; কারণ এই বিষয়গুলি বাইবেলে ছিল না। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। এখানকার রাজকর্মচারীদের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন অবশ্য পাঠ্য ছিল। বাইজেন্টাইন পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সব বিষয় একত্রিত করে সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া ইতিহাস, সাধু-সন্তের জীবনী, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনেক পুস্তকও এসময় রচিত

হয়েছিল। সম্রাটগণ শিক্ষানুরাগী ও পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট সপ্তম কনস্টান্টাইন অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। গির্জার অধ্যক্ষগণও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে পন্টিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এখানে আইন ও দর্শনের সাথে সাহিত্য ও বিজ্ঞান পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অনুশীলনী

১। বাইজেন্টাইন সভ্যতার উন্মেষ কখন হয়েছিল? এই সভ্যতার বিকাশে কনস্টান্টাইনের অবদান কি?

২। জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন? রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কি করেছিলেন?

৩। জাস্টিনিয়ানের আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে যা জান লেখ। এই আইন দেশের কি পরিবর্তন এনেছিল?

৪। জাস্টিনিয়ান প্রবর্তিত আইন কোডের গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৫। জাস্টিনিয়ানের সময় দেশের স্থাপত্য ও শিল্পকলা কি রকম বিকাশলাভ করেছিল?

৬। বাইজেন্টাইন সভ্যতা দেশ ও জনজীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল? প্রতিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) বেলিসেরিয়াস কে ছিলেন? তাঁর অবদান কি?

(খ) আইন কমিশন কখন গঠিত হয়েছিল?

(গ) 'ডাইজেস্ট' ও 'ইনস্টিটিউট' পুস্তকগুলিতে কি থাকত? এগুলি কোন্ ভাষায় লেখা হয়েছিল?

(ঘ) সান্টাসোফিয়া গির্জা কোন্ সময়ে নির্মিত হয়েছিল?

(ঙ) বাইজেন্টাইন স্থাপত্য শিল্প কাকে বলে?

(চ) পন্টিয়াস কে ছিলেন?

(ছ) 'শেষ রোমান সম্রাট' কাকে এবং কেন বলা হয়?

৮। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) বাইজেন্টাইন অবস্থিত—কৃষ্ণসাগরের তীরে/ইতালীতে।

(খ) বেলিসেরিয়াস ছিলেন—একজন রাজা/একজন সেনাপতি।

(গ) রোমান সাম্রাজ্যের আইনগুলি সুলিখিত হয়েছিল—
জাস্টিনিয়ানের আমলে / কনস্টান্টাইনের আমলে।

(ঘ) জাস্টিনিয়ানের সময়কে স্থাপত্য শিল্প ও চিত্র শিল্পের—অবনতির
যুগ/চরম উন্নতির যুগ বলা হয়।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) কনস্টান্টাইন ছিলেন একজন রোমান —।

(খ) — পারস্যরাজ খসরুর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান চালিয়েছিলেন।

(গ) দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্ ছিলেন — সম্রাট।

(ঘ) সাণ্টাসোফিয়া গির্জা — সময়ে নির্মিত হয়।

(ঙ) সাণ্টাসোফিয়া গির্জার গম্বুজের উচ্চতা — ফুট।

———

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়
আরব জাতি
হজরত মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষা
আরব সাম্রাজ্য :
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের অবদান
আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ

আরব দেশ : আরবগণ সেমিটিক জাতির লোক। এদের বাসস্থান আরব দেশে। আরব দেশের তিন দিকেই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ; আর মাঝে রয়েছে বিরাট মরুভূমি। প্রাচীনকালে সাগরের উপকূল-ভাগেই মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। শস্য সম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ ছিল না। তাই প্রাচীন যুগে কোন সভ্য জাতি এই দেশ আক্রমণ করে নি ; আরবগণও তাদের দেশ ছেড়ে কোথাও বসতি বিস্তারের চেষ্টা করে নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এখানে কোন শক্তিশালী রাজ্যও স্থাপিত হয় নি।

আরব জাতি : প্রাচীন কাল থেকেই সাগরের উপকূল অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রামেই আরবগণ বাস করতে আরম্ভ করেছিল। কৃষি ও পশুপালন করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। অন্যান্য জাতির মত আরবগণও ক্রমশঃ উন্নত হয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত ছিল। গণিত ও কবিতার অনুশীলনে আরবগণ যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠানও দেশের নানা স্থানে হত ; নানা স্থানে মেলা বসত, মেলায় কবিতার প্রতিযোগিতা হত। ভাল কবিতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হত। ব্যবসা-বাণিজ্যেও আরবগণ পিছিয়ে ছিল না। অনেক দিন আগে থেকেই মিশর, সিরিয়া ও ভারতের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

আরব বেদুইন : আরবদের মধ্যে আর এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল। এদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। এরা ছিল যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। এদেরই 'আরব বেদুইন' বলা হয়। বেদুইনদের

অনেক দল ছিল। প্রত্যেক দলের একজন দলপতি বা সর্দার থাকত। বেদুইনরা দলপতির আদেশ মেনে চলত। কোন কোন দল মরুভূমির মাঝে গাছপালা যুক্ত জায়গায় বা মরূদ্যানের কাছে বাস করত। মরূদ্যানে অনেক খেজুরের গাছ থাকত। বেদুইনরা ভেড়া, উট, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও সঙ্গে রাখত। খেজুর, গৃহপালিত প্রাণীর দুধ ও মাংসই বেদুইনদের প্রধান খাদ্য ছিল। এদের প্রকৃতি ছিল খুব দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর। স্বাধীন জীবনযাত্রাই এরা পছন্দ করত। মরুভূমির কাছে বাস করার ফলে বেদুইনরা কষ্টসহিষ্ণু ও শক্তিশালী যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। বেদুইন দলের মধ্যে ঝগড়া মারামারি প্রায় লেগেই থাকত। বসন্তকালে যখন মক্কায় মেলা বসত এই সময় ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ থাকত।

মক্কা ও মদিনা ঃ মক্কা ও য়াথ্রিব (মদিনা) আরব দেশের দুটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রাচীন কাল থেকে মক্কা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। কথিত আছে, বহুকাল পূর্বে আদি মানব আদমই প্রথমে এখানে একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরে অনেক দেবদেবীর মূর্তিও ছিল। কালের প্রভাবে এই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় ; পরে নতুন মন্দির তৈরী হয়। দেবদূত জেব্রাইল এই মন্দিরে একটি চৌকা পাথর বসিয়ে দিয়েছিলেন। এই মন্দিরকে কাবা বলা হয়। য়াথ্রিব বা মদিনা হজরত মহম্মদের সময় থেকে তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

হজরত মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষা

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদাল্লা ও মাতার নাম আমিনা। আবদাল্লা মক্কার কোরেশি বংশের লোক ছিলেন। কাবার মন্দিরের পরিচালনার ভার এই বংশের হাতেই ছিল। পিতৃব্য আবুতালিব তাঁকে প্রতিপালন করেছিলেন। জন্মের পূর্বেই মহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়। ছোটবেলাতেই মায়েরও মৃত্যু হয়। বাল্যকালে কিছু লেখাপড়া শেখার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে

মহম্মদ খাদিজা নামে এক ধনী মহিলার ব্যবসা দেখাশোনার কর্মচারী-রূপে নিযুক্ত হন ও কিছুদিন পরেই এই মহিলাকে বিবাহ করেন।

বাল্যকালে কাবার মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মের তীর্থযাত্রীদের দেখার সুযোগ মহম্মদ পেয়েছিলেন। ব্যবসায় নিযুক্ত থাকার সময় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মেলামেশা করে তাঁদের ধর্মমত জানার সুযোগও মহম্মদের হয়েছিল।

ঈশ্বর চিন্তা ঃ বাল্যকাল থেকেই মহম্মদ চিন্তাশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিবাহের পর তাঁর অন্নসংস্থানের চিন্তা ছিল না। এই সময় তিনি ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কোন নির্জন স্থানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ধর্মচিন্তায় সময় কাটাতেন। ধর্ম-চিন্তায় তন্ময় হয়ে তিনি ভগবানের বা আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পেতেন। এইভাবে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্যই আল্লাহ্‌ তাঁকে পাঠিয়েছেন। মহম্মদের প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম। এই ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর এক এবং দেব-দেবী বা মূর্তি পূজা অন্যায়।

মক্কায় তিনি তাঁর নতুন ধর্মের কথা প্রচার করলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সমর্থন পেলেন না। লোকে তাঁকে উপহাস করতে আরম্ভ করল। মক্কার ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর উপর চটে গেলেন। তাঁরা মহম্মদের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রও শুরু করে দিলেন।

এই খবর পেয়ে মহম্মদ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আবুবকরকে সাথে নিয়ে য়াথ্রিবে পালিয়ে গেলেন। এই সময় অর্থাৎ ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে মুসলমানদের নতুন বৎসর গণনা করা আরম্ভ হল; একে হিজিরা বা মহাপলায়ন বলে। এই সময় থেকে য়াথ্রিবের নতুন নাম হল মদিনা বা পয়গম্বরের শহর।

মক্কা অধিকার ঃ মদিনায় মহম্মদের শিষ্যের অভাব হল না। তাঁর নতুন ধর্মে অনেকে আকৃষ্ট হলেন। সেখানে একটি মসজিদও তৈরী হল। সাত বছর পরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি যখন খুব বেড়ে গেল তখন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মক্কা আক্রমণ করলেন। অনেক

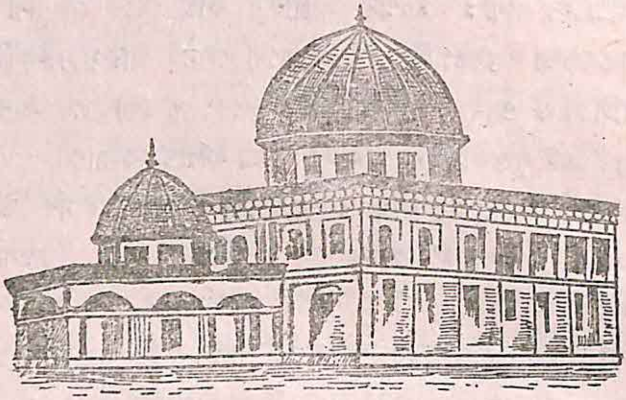
বেদুইন মহম্মদের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা অধিকার করে কাবা মন্দিরের মূর্তিগুলি তিনি ভেঙ্গে ফেললেন। এখানকার উৎসবগুলি ইসলাম ধর্মের সাথে যুক্ত করা হল। এর দু'বছর পর ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

মহম্মদের বাণী ঃ মহম্মদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে বাণী পেয়েছিলেন সেগুলি সম্ভবতঃ তিনি লিখে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পর খলিফা ও ওসমান এগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ।

কোরাণ—মহম্মদের শিক্ষা ঃ কোরাণে ইসলাম ধর্মের উপদেশ লেখা আছে। 'ইসলাম' কথার অর্থ ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। ঈশ্বর এক বা অদ্বিতীয়। তাঁর পুজাই মুসলমানদের পবিত্র কর্তব্য। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, জগতের শাসন ও পালন কর্তা। তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে; রমজান মাসে দিনের বেলা উপবাস করবে আর জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কায় তীর্থ করতে যাবে। আল্লাহ্‌ মহম্মদকে তাঁর বাণী প্রচারের ভার দিয়েছেন, তাই তিনি মুসলমানদের পয়গম্বর।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ ঃ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর এক শ' বছরের মধ্যেই ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্মের প্রসার খুবই বিস্ময়কর। ইসলাম ধর্ম প্রসারের প্রথম ও প্রধান কারণ এই ধর্ম খুব সহজ ও সরল; কোন জটিল ধর্মতত্ত্ব, পোপ বা পুরোহিতদের প্রাধান্য ইসলাম ধর্মে নেই। লেখাপড়া না শিখেও যে কোন ব্যক্তি এই ধর্ম মেনে চলতে পারে। ইসলাম ধর্মগ্রহণকারীদের দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠা এই ধর্মের ব্যাপক প্রসারের দ্বিতীয় কারণ। বিধর্মীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সুযোগ দেওয়াই আল্লাহ্‌র আদেশ। ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে স্বর্গলাভ, আর জয়লাভ করলে পরাজিত ব্যক্তির ধনসম্পদ লাভ। ধর্মান্ধতাই ইসলাম ধর্ম প্রসারের প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে সহনশীলতার

উদাহরণও যথেষ্ট আছে। শুধু ধর্মীয় কর দিয়ে এঁদের সাম্রাজ্যে অনেক লোক বাস করতে পারত। আরব দেশের লোকেরা খুব গরীব ছিল। বসবাস করার জন্য অনেক আগেই আরবগণ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ও পারস্যে গিয়েছিলেন। ধন লাভের জন্যই আরবগণ



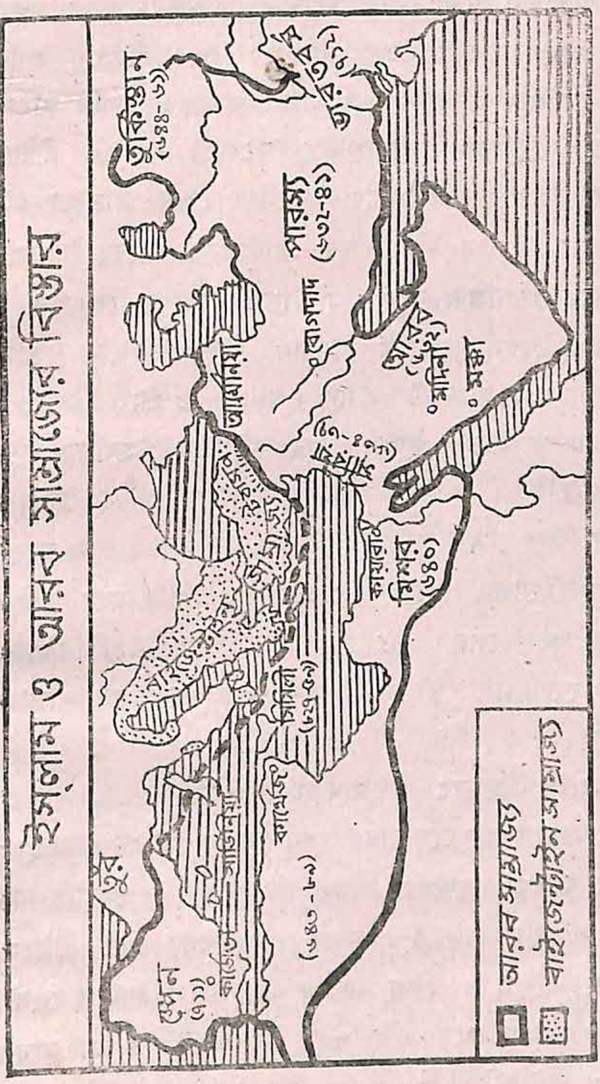
"ডোম অফ দি রক"
জেরুসালেমে মহম্মদের স্মৃতিসৌধ

দলে দলে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থাও ইসলাম ধর্মের প্রসারের অনুকূল ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আরবদের প্রতিরোধ করার মত শক্তিশালী কোন সাম্রাজ্য সে সময়ে ছিল না।

আরব সাম্রাজ্য

খলিফাঃ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য আবুবকর (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) আরবদের খলিফা বা ধর্মগুরুর পদ গ্রহণ করেন। খলিফাগণ রাজ্য শাসনও করতেন। আবুবকরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওমর (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ)। আরবগণের তৃতীয় খলিফা উম্মিয়াদ বংশের ওসমান ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় খলিফার পদ নিয়ে দুই আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। আরবগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা

শিয়া সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এরা কোরাণের ভিত্তিতে হজরত মহম্মদের বংশের লোকদের খলিফা করতে চেয়েছিলেন। আরবদের



দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম সুন্নী সম্প্রদায়। এঁরা আরবগণের প্রাচীন প্রথা অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফার পদ পূরণ করতে চেয়েছিলেন। এর পর মহম্মদের কন্যা ফতেমার স্বামী আলি

৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের খলিফার আসনে বসেন। এই সময় আরবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সিরিয়ার শাসনকর্তা মাবিয়া উম্মিয়াদ বংশের লোক ছিলেন। তিনি নিজেকে জেরুসালেমের স্বাধীন খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলি নিহত হন ও মাবিয়া খলিফার পদ লাভ করেন। তিনি মদিনা থেকে ডামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উম্মিয়াদ বংশের খলিফাগণ ডামাস্কাস থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এর পর আবুল আব্বাসের নেতৃত্বে উম্মিয়াদ বংশের খলিফাদের পরাজিত করে, আব্বাসাইড বংশের লোকেরা খলিফার পদ লাভ করেন। এদের রাজধানী ছিল বাগদাদে। আব্বাসাইড খলিফাদের মধ্যে হারুণ-উল-রসিদ (৭৮৬-৮০৬ খ্রীঃ) বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় বাগদাদে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মসজিদ ও রাজপথ নির্মিত হয়েছিল। হারুণ-উল-রসিদ দয়ালু ও ধার্মিক লোক ছিলেন। প্রজাদের উপকারের জন্য তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন। সাম্রাজ্যে বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি লোকের মন জয় করেছিলেন। এই সময় বাগদাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলগণ এই সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

সাম্রাজ্য বিস্তার: ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরই আরবদের বিজয় অভিযান শুরু হয়ে যায়। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, না হয় মৃত্যু—এই ছিল আরব সৈন্যদলের সংকল্প। কোরাণ ও তরবারি নিয়ে তারা বিজয় অভিযান চালিয়ে ছিলেন। আরবগণ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য জয় করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও জেরুসালেম জয় করে এঁরা ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মিশর জয় করেছিলেন। এর পর সাইরেনিকা ও ত্রিপলি জয় করে ৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ আরবগণ কার্থেজ দখল করেন। এখানকার পার্বত্য অধিবাসীদের তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং এদের সাহায্যে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো জয় করেন। 'তারিখ' নামে এক নেতা 'গেট অফ হারকিউলিস'

পার হয়ে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিও অধিকার করেন। এই স্থানের নাম দেওয়া হয় 'জেবেল-অল-তারিখ'। এই স্থানের নামই পরে জিব্রালটার হয়েছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চলগুলি ছাড়া সমগ্র স্পেনদেশ আরবদের অধিকারে আসে। তা ছাড়া বোখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি জয় করে আরবগণ ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। পশ্চিমে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নিউবিয়া ও সাহারা অঞ্চল দখল করে আরবগণ আফ্রিকাতেও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

কর্ডোভা: আরবদের মধ্যে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল সে সময় আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি স্পেনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। কর্ডোভা আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইসলাম ধর্মের সাফল্যে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া: বিজয় অভিযানে আরবগণ দুটি জায়গায় বাধা পেয়েছিলেন। প্রথমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের উপর বারবার অভিযান চালিয়েও আরবগণ এই স্থান দখল করতে পারেন নি। দ্বিতীয়বার এঁরা বাধা পেয়েছিলেন গল দেশে। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস মার্টেল ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পয়টিয়ার্সের যুদ্ধে আরব সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুর রহমানকে পরাজিত করে সমগ্র ইউরোপকে আরব বিজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। যুদ্ধে ইউরোপ জয় করতে না পারলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতা আরব সভ্যতার কাছে বহু বিষয়ে ঋণী।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবগণের অবদান

আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি: আরব সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের অবদান অতুলনীয়। আরব সভ্যতার উন্নতির মূল কারণ ইসলাম ধর্ম। মুসলমানদের কোরাণ পাঠ ও মক্কায় তীর্থযাত্রা অবশ্য কর্তব্য বলে

বিবেচিত হত। এর ফলে যেমন আরবী ভাষার উন্নতি হয়েছিল তেমনি বিদেশে ভ্রমণের ফলে নানা দেশের লোকদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। বিশাল আরব সাম্রাজ্যে মুসলমান ব্যবসায়ীদের কোন স্থানে বাণিজ্য-কর দিতে হত না। মিশর, পারস্য, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের লোকেরা শিক্ষায় ও সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিলেন। বাইজেন্টাইন শিল্পের অনুকরণে আরবগণ তাদের দেশে সুন্দর সুন্দর মসজিদ তৈরি করেছিলেন। আব্বাসাইড খলিফাদের সময় বাগদাদে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটেছিল। গ্রানাডার আল্‌হামরা প্রাসাদ আজও সেকালের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। রাজধানী, রাজপ্রাসাদের জন্যও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি হয়েছিল। পারস্যের অনুকরণে মুসলমান সম্রাটগণ বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন ও জাঁকজমক পূর্ণ রাজদরবারে বসতেন, এগুলি সবই পরে ইউরোপের রাজাদের আদর্শ হয়েছিল। কৃষিকাজেও আরবগণ বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন। জলসেচের ব্যবস্থা করে মিশরে প্রচুর গম উৎপাদন করা হত। মক্কার জনসংখ্যা সে সময় খুব বেড়ে গিয়েছিল। নানা রকম মূল্যবান পোশাক, কার্পেট, সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী অলঙ্কারও ইউরোপবাসী আরবদের কাছে শিখেছিলেন। তুঁত গাছ থেকে গুটিপোকার চাষ ও রেশম উৎপাদনের পদ্ধতিও আরবদের কাছ থেকে ইউরোপে এসেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত ও বীজগণিত প্রভৃতি বিষয়ে আরবগণ খুবই উন্নত ছিলেন। ইউরোপবাসীর জীবনে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষ ঃ চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত ইত্যাদি বিষয় আরবগণ হিন্দুদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। এ সকল বিষয়ের অনুবাদে আরব পণ্ডিতগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শূন্যের (০) সাহায্যে গণিতের সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ভারতের কাছ থেকে শিখে আরবগণ ইউরোপে প্রচার করেছিলেন। বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও আরবের পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আরব সাম্রাজ্যের বহু স্থানে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বাগদাদ, নিশাপুর, ডামাস্কাস, জেরুসালেম, কাইরো, আলেকজাণ্ড্রিয়া, কর্ডোভা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণা করতেন। বহু দেশ থেকে শিক্ষার্থী এসে এখানে শিক্ষা লাভ করত।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণঃ বিখ্যাত কাব্য লেখক ওমরখৈয়াম গণিতশাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত পণ্ডিত হুনাইন ইবন-ইসাক (৮০৯-৭৭ খ্রীঃ) গ্রীক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বইগুলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইবন-সিন্না (৯৭৮-১০৩৭ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কর্ডোভার বিখ্যাত দার্শনিক ইবন-রসিদের (১১২৬-৯৮ খ্রীঃ) নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

১। আরব জাতি কোন্ দেশের বাসিন্দা? এদের জীবনধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। আরব বেতুইন কাদের বলা হয়? এদের সম্পর্কে কি জান লেখ।

৩। আরব দেশটি কেমন? দেশটির বিশেষ প্রকৃতি জনজীবনকে কিভাবে গড়ে তুলেছে?

৪। হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কি জান? তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম কি? এই ধর্ম কিভাবে প্রসার লাভ করে?

৫। হজরত মহম্মদের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ কর। মহম্মদের ঈশ্বর চিন্তা বিষয়ে কি জান?

৬। আরব সাম্রাজ্য কখন এবং কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার বিশদ আলোচনা কর।

৭। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের কি কি অবদান ছিল?

৮। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আরবগণের যে বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) পয়গম্বর কি? হজরত মহম্মদ কি একজন পয়গম্বর?

(খ) মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে কি জান?

(গ) আরব জাতির আদি বাসস্থান এবং প্রধান জীবিকা কি ?

(ঘ) সুন্নী সম্প্রদায় কাদের বলা হত ?

(ঙ) 'জেবেল-অল-তারিখ' কি ?

১০। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) মদিনা থেকে ডামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন—
মাবিয়া/আবুবকর ।

(খ) হারুণ-উল-রসিদ ছিলেন একজন—কবি/খলিফা ।

(গ) ওমরখৈয়াম ছিলেন একজন—কবি/সেনাপতি ।

(ঘ) মক্কা ও মদিনা হল দুটি প্রধান—দেবতা/তীর্থস্থান ।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আরবগণ——জাতির লোক ।

(খ) ——নগরে হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ।

(গ) মহম্মদের পিতার নাম—— ও মাতার নাম——ছিল ।

(ঘ) ——মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ।

(ঙ) আবুবকর ছিলেন——প্রিয় শিষ্য ।

ষষ্ঠ অধ্যায়	মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০–১২০০ খ্রীষ্টাব্দ শার্লামেন (চার্লস দি গ্রেট) মঠ ও আশ্রম ইনভেস্টিচার বা অভিজ্ঞান সমস্যা মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা

শার্লামেন (চার্লস দি গ্রেট : ৭৭১-৮১৪ খ্রীঃ) : কার্লোভিঞ্জি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট শার্লামেন ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসন-লাভ করেছিলেন। তিনি শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশের অরাজকতা দূর করে তিনি সর্বপ্রথম শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মে তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

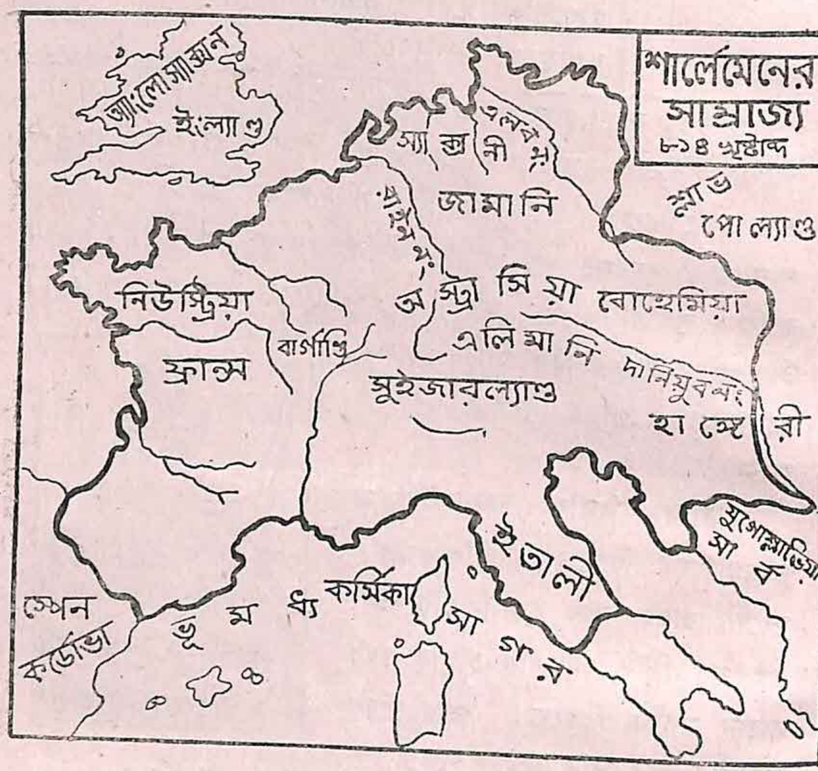


শার্লামেন

সাম্রাজ্য বিস্তার অ্যাকুইটিয়ান ও লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তিনি তাদের রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। এর পর তিনি অভিযান চালান দুর্ধর্ষ সাক্সন জাতির বিরুদ্ধে। প্রায় ত্রিশ বছর যুদ্ধ করে তিনি এদেরও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন। ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, জার্মানী, ইতালী, চেকোস্লাভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রায় অর্ধেক ইউরোপ শার্লামেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এইজন্যই এঁকে বলা হয় মহাবীর "চার্লস দি গ্রেট"।

শাসনব্যবস্থা : শার্লামেন স্বৈরাচারী শাসনকর্তা হলেও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ করে, প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন শক্তিশালী শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। শাসন-শৃঙ্খলা, বিচার, আর্থিক

দায়িত্ব সবই তাঁদের হাতেই থাকত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা কাউন্টগণ যাতে শক্তি বৃদ্ধি না করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র



রাজ্যের খবর সংগ্রহের জন্য তিনি এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তাদের বলা হত রাজদূত বা মিসিডোমিনিসি।

আইন: শার্লামেন নিজে কোন আইন প্রণয়ন না করলেও মাঝে মাঝে আদেশ জারি করে শাসন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে শাসনকর্তাদের সচেতন করে দিতেন। সামন্তগণ সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। সৈন্যের সংখ্যা নির্ভর করত জমির পরিমাণের উপর।

পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান: সেই সময় রোমের পোপের আচরণে সামন্তগণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। সামন্তদের ভয়ে ভীত হয়ে পোপ শার্লামেনের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। শার্লামেন পোপকে তাঁর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর

এক অনুষ্ঠানে পোপ শার্লামেনের মাথায় রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে সম্মানিত করেন। এই ভাবে প্রাচীন রোম সম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

অভিষেকের গুরুত্ব ঃ রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও এই সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায়নি। এর পূর্বে কোন জার্মান বংশীয় সম্রাট এই সম্মান লাভ করেন নি। শার্লামেনের রাজত্বের আগে বাইজেন্টাইন সম্রাটগণ রোমান সম্রাট বলে স্বীকৃত হতেন। এই অভিষেকের ফলে শার্লামেনই হলেন প্রকৃত রোমান সম্রাট। রোমের পোপরাও বাইজেন্টাইন সম্রাটের অধীনতা থেকে মুক্ত হলেন। রোমের পোপ যখন শার্লামেনকে 'আগাস্টাস', 'সীজার' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করলেন তখন শার্লামেনের সম্মানও অনেক বেড়ে গেল। তাই ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব কম নয়।

গির্জার সাথে সম্রাটের সম্বন্ধ ঃ শার্লামেন ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলেই মনে করতেন। রাজ্য রক্ষার মত দেশের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনি তাঁর দায়িত্ব বলে মনে করতেন। ধর্মযাজকগণ শিক্ষিত হবেন, তাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করবেন, এর সাথে রাজার আনুগত্যও তাঁদের স্বীকার করতে হবে, এই ছিল শার্লামেনের ধারণা। ধর্মযাজক নিয়োগ, তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি, গির্জার আয়-ব্যয়ের হিসাব সব বিষয়ে তিনি কর্তৃত্ব করতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নবযুগের সূচনা ঃ শার্লামেন শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর রাজত্বকালকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবযুগ বলা হয়ে থাকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ঃ নিজে বেশী লেখাপড়া না জানলেও শার্লামেন তাঁর রাজসভায় বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের স্থান দিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য তিনি একটি স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সারা

ইউরোপে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। শার্লামেন নিজেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অংশ গ্রহণ করতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তানগণ ও দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের জন্যও স্কুল খোলা হয়েছিল। শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন অ্যালকুইন নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ইংলণ্ডের লোক ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষা লাভের জন্য অ্যালকুইন অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ডীকন পল, থিওডলফ্‌ অ্যাঞ্জিলবার্ট, পলিনস ও ইনহার্ড্‌ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণকে ইউরোপের নানা দেশ থেকে আনিয়ে তিনি এক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহৎ আলোচনা সভা বা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গির্জা ও মঠে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : শুধু রাজধানীতে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, মঠ ও আশ্রম, শহর ও গ্রামাঞ্চলের গির্জাগুলিতেও তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সব বিদ্যালয়ে ল্যাটিন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন পুঁথি নকল ও রক্ষা-ব্যবস্থা : রোমান সাম্রাজ্য বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে দেশের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে হাতে লেখা পুঁথিগুলি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তিনি এগুলি নকল করে সযত্নে মঠে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সাধু বেনিডিক্টের সন্ন্যাসীদের পালনীয় নিয়মগুলিও নকল করে রাখা হয়েছিল।

ধর্ম পুস্তকগুলি যাতে সকলে বুঝতে পারে এর জন্য এই পুস্তকগুলির টীকা বা সরলার্থ লেখার কাজও তাঁর সময়েই শুরু হয়েছিল।

অনুবাদ ও ভাষা রচনা : এই সময় ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লেখারও প্রচলন হয়েছিল। পলডিকন 'লম্বার্ডদের ইতিহাস' রচনা করেছিলেন। জন স্কট এই সময়কার বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। এই সময়ে অনেক কবিতার পুস্তকও লিখিত হয়েছিল। সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা ও দেশীয় ভাষার অনুশীলন এই সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। শার্লামেনের সুনাম বাইরের জগতেও প্রচারিত হয়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুন-উল-রসিদ শার্লামেনের সাহায্য চেয়ে তাঁর সভায়

দূত পাঠিয়েছিলেন। বাইজেন্টাইন শিল্পের অনুকরণে তাঁর রাজধানী ও সাম্রাজ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মিত হয়েছিল।

মঠ ও আশ্রম

মঠ কাকে বলে ঃ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। সাধারণ ধর্মযাজক বা প্রথম শ্রেণীর ধর্মযাজকগণ পরিবারের মধ্যে বাড়ীতে বাস করতেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম-যাজকগণ পরিবার নিয়ে বাড়ীতে বাস করতেন না। কোন নির্জন স্থানে গিয়ে, শান্ত পরিবেশের মধ্যে ছোট বাড়ী তৈরি করে তাঁরা সেখানেই থাকতেন। এঁদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কিছুই থাকত না; ধ্যান, ধারণা ও ঈশ্বরের উপাসনা করে এই সব স্থানেই এঁরা দিন কাটাতেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের উপাসনার স্থানগুলিকে মঠ বা আশ্রম বলা হয়ে থাকে।

মঠের উদ্ভব ঃ আশ্রম ও মঠ ইউরোপেই প্রথমে স্থাপিত হয়নি। প্রাচ্যেই মঠ গড়ে উঠেছিল অনেক দিন আগেই। মিশরে সর্বপ্রথম মঠ স্থাপিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঘটেছিল। অনেক সম্রাট ও ধনী ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মঠে অনেক ধনসম্পদ দান করেছিলেন। তাঁদের দানেই মঠের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়েছিল। মঠের অধিবাসী ধর্মযাজকগণও বেশ আরামেই দিন কাটাতেন। তাঁদের জীবনযাপনের জন্য কোন বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন ছিল না। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সাধু মার্টিনের মঠ প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে মঠে নানা গোলমাল দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। অনেক অসাধু ব্যক্তি এসে মঠে বসবাস আরম্ভ করে দিয়েছিল।

সাধু বেনিডিক্ট ঃ বেনিডিক্ট ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখাপড়া শেখার পর, সে যুগের নাগরিক জীবনের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে বিতৃষ্ণা আসে। সংসার ত্যাগ করে তিনি ধর্মজীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে ক্যাসিওনোর নির্জন পাহাড়ের

উপর একটি ছোট মঠ নির্মাণ করেন। তাঁর ত্যাগ ও ধর্মানুরাগ দেখে সে কালের অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে এই মঠ খুব বড় হয়ে ওঠে। বেনিডিক্ট মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের জীবনযাপনের জন্য কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন। এই নিয়মগুলি 'সাধু বেনিডিক্টের নিয়মাবলী' নামে প্রসিদ্ধ। সন্ন্যাসীগণের জন্য পৃথক মঠ ছিল।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাপনের নিয়মাবলী ঃ মানব জীবনের মুক্তিসাধন আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সরল ও পবিত্র জীবনযাপন, ধর্মানুশীলন ও সংঘগুরুর আদেশ পালন তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। বিবাহ করা ও কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা সন্ন্যাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে সকল মঠবাসী প্রার্থনায় যোগদান করত। দিনের মধ্যে কয়েকবারা সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত।



মঠের সন্ন্যাসী

তা ছাড়া ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, উপাসনা, শাস্ত্রানুশীলন ও পাঠাভ্যাস প্রতিদিনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। মঠবাসীকে প্রতিদিন কিছু সময় কায়িক শ্রম করতে হত। মঠের জীবনে আলস্যের স্থান ছিল না। নিদ্রার জন্য আট ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল।

আশ্রমবাসীদের দিনে দু'বার খাবার দেওয়া হত। খাদ্যের মধ্যে প্রতি মঠবাসীর জন্য শাক-সব্‌জি, ফল-মূল ও প্রতিদিন এক পাউণ্ড রুটি দেওয়া হত। মাংস ভোজন তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মদ্য পানে কোন বাধা ছিল না।

মঠে প্রবেশ করার পর প্রত্যেক মঠবাসীকে কিছুদিন শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে হত। সাফল্যের সহিত এই শিক্ষানবীশ জীবন কাটাবার পর আশ্রমবাসীকে সন্ন্যাসী করা হত। প্রতি মঠে একজন অধ্যক্ষ থাকতেন। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ নির্বাচনের মাধ্যমে অধ্যক্ষ নিয়োগ করতেন। রোমান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধ্যক্ষ নির্বাচনই সবচেয়ে প্রাচীন গণতান্ত্রিক প্রথা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও সংরক্ষণে মঠের ভূমিকা: সাধু বেনিডিক্টের আদর্শে ক্রমে ইউরোপের অনেক স্থানে মঠ স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক মঠের সাথে একটি করে বিদ্যালয় যুক্ত থাকত। ক্যাসিওডোরাস নামে এক ব্যক্তি মঠ স্থাপনের বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তিনি আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের সাহায্যে ইতালী ও উত্তর আফ্রিকা থেকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন ও সেগুলি মঠে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ভাবে প্রতি মঠে প্রাচীন পুঁথি নকল করে রাখার প্রথা গড়ে উঠেছিল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বইগুলি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ক্যাসিওডোরাস একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজে গথদের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। প্রতি মঠে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও পাঠাগার থাকত। তা ছাড়া সন্ন্যাসীগণ নাগরিকগণকে নানা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতেন।

পোপ গ্রেগরীর সময় থেকে রোমের পোপগণ মঠ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলে আয়ারল্যাণ্ডে অনেক মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইরিস সন্ন্যাসীগণ অনেক প্রাচীন পুঁথি নকল করে তাঁদের মঠে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানকার মঠগুলিতে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্স, জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অনেক মঠ স্থাপিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী থেকে ইউরোপের জনসাধারণের শিক্ষার

ভার আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণই গ্রহণ করেছিলেন। বাইবেল ও সাধু-সন্তের জীবনী আশ্রমের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ান হত। সম্রাট শার্লামেন (চার্লস দি গ্রেট) সমস্ত মঠ ও গির্জায় বিদ্যালয় স্থাপন করার আদেশ প্রচার করেছিলেন। মঠবাসী সন্ন্যাসীগণ নিজেরাও অনেক বই লিখেছিলেন ; ছেলেমেয়েদের উপযোগী অনেক পাঠ্য পুস্তকও এই সময় রচিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত বীড একজন আশ্রমবাসী ছিলেন। তিনি "ইংলণ্ডের ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাস" নামে একখানি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন। বীডের আশ্রমে শিষ্য সংখ্যাও কম ছিল না। মধ্যযুগের সন্ন্যাসীগণ দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা করে ও প্রাচীন পুঁথিগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিলেন।

গির্জার সংস্কার ঃ ক্লানী সম্প্রদায় ঃ দশম শতাব্দী থেকে রোমের গির্জাগুলির অবস্থার অবনতি ঘটতে আরম্ভ করেছিল। এই সময় পোপের প্রাধান্যও অনেক কমে গিয়েছিল। পোপের পদ লাভ করার জন্য অনেক অসাধু উপায় অবলম্বন করা হত। উৎকোচ দান, ষড়যন্ত্র, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করাও হত। সাধারণ গির্জার অবস্থাও ভাল ছিল না। মঠ ও আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণও আলস্যপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। গির্জার পুরোহিতগণ ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে নিজ নিজ সংসারের উন্নতি বিধানে যত্নবান হতে আরম্ভ করেছিলেন। গির্জার সম্পত্তিগুলি তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের দান করতেও ইতস্ততঃ করতেন না। গির্জার পুরোহিতদের পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করার প্রথা ছিল ; কিন্তু শক্তিশালী রাজপুরুষগণ নানা উপায়ে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকেই পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রতি মঠের অনেক ভূসম্পত্তি থাকত। রাজা বা বড় বড় সামন্তগণের কাছ থেকেই মঠাধ্যক্ষ সম্পত্তি লাভ করতেন। এর প্রতিদানস্বরূপ মঠাধ্যক্ষগণও রাজাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। কোন কোন ধর্মযাজক রাজার পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করতেন।

ক্লানী সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ উপরোক্ত অসদাচরণ, সাংসারিক বিষয়ে অনুরাগ ও সামন্তদের প্রভাব থেকে গির্জাগুলিকে মুক্ত করার জন্য ইউরোপে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। গির্জার এই সংস্কার আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অ্যাবট-ও-ডিলো-ক্লানী (৯৯৪-১০৪৯ খ্রীঃ)। গির্জার সংস্কারের কাজে এখানকার সন্ন্যাসীগণের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ক্লানী সম্প্রদায়ের সংস্কারক বলা হয়ে থাকে। ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লানীর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মঠগুলিকে সামন্তদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এখানকার সন্ন্যাসীগণই প্রথমে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। রোমের পোপ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির আদেশ মানা হবে না বলে স্থির করা হয়েছিল। এই সময় অনেক নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ও পুরাতন আশ্রমগুলির সংস্কার করা হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য স্থানের মঠগুলিকেও ক্লানীর মঠের অধ্যক্ষের অধীনে আনা হয়েছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানের মঠাধ্যক্ষগণ কোন বিশেষ স্থানে মিলিত হয়ে সভা করতেন। এই সভায় মঠের উন্নতি বিধানের জন্য নতুন নিয়মকানুন রচিত হয়। ক্লানী সম্প্রদায়ের গির্জা সংস্কারের আন্দোলন ক্রমে ফ্রান্স, স্পেন, লোরেন ও ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ ক'রছিল।

সংস্কারের বিষয় ঃ ক্লানী সম্প্রদায়ের সংস্কারের মধ্যে নতুন কথা বিশেষ কিছুই ছিল না। সাধু বেনিডিক্টের নিয়ম পালন, সন্ন্যাস জীবনে পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য পালন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। ধর্মীয় প্রধান বা পোপই ধর্মযাজকদের অভিজ্ঞান (অঙ্গুরী ও দণ্ড) প্রদান করবেন বলে স্থির করা হয়েছিল। গির্জাগুলিকে সামন্তদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

ফলাফল ঃ ক্লানী সম্প্রদায়ের সংস্কার আন্দোলন দমন করার চেষ্টাও কম করা হয়নি। বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য ধর্মযাজকগণ এই সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। জার্মান সম্রাটগণ

গির্জার উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজী হন নি। পোপগণ ক্লানী সম্প্রদায়ের সংস্কারকগণের পক্ষে ছিলেন; এর ফলেই রাজাদের সাথে তাঁদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল।

ইনভেস্টিচার (Investiture) বা অভিজ্ঞান সমস্যা

রোমান ক্যাথলিক গির্জার ধর্মযাজকগণ দেশের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। বিশপ, আর্চবিশপ ও অন্যান্য পুরোহিতগণ তাঁদের পদের নিয়োগের সময় রাজার কাছ থেকে অভিজ্ঞান বা প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ একটি দণ্ড ও একটি অঙ্গুরী পেতেন। এই অভিজ্ঞান বা প্রতীক চিহ্নকে ইনভেস্টিচার বা অভিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। রাজাই বরাবর ধর্মযাজক নিয়োগের কর্তা ছিলেন। ক্লানী সম্প্রদায়ের সংস্কারকগণ দাবি করলেন যে, দেশের ধর্মীয় প্রধান বা পোপই গির্জার ধর্মযাজক নিয়োগ করবেন ও অভিজ্ঞান প্রদান করেন। আসল সমস্যা বা বিরোধ হল ধর্মযাজক নিয়োগ নিয়ে। ইউরোপের কোন কোন দেশের রাজা তাঁদের ধর্মযাজক নিয়োগের অধিকার ছাড়তে রাজী ছিলেন না; আবার কোন কোন দেশের রাজা সংস্কারকদের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন পোপই ধর্মযাজক নিয়োগের আসল কর্তা।

রাজা ও পোপের মধ্যে বিরোধ ঃ রোমের পোপ সপ্তম গ্রেগরী সংস্কারকদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। পোপই ইউরোপের ধর্মজগতের কর্তা—এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি সমস্ত বিবাহিত ধর্মযাজকদের গির্জা থেকে সরিয়ে দিলেন; আর ঘোষণা করলেন যে, নতুন ধর্মযাজক নিয়োগ ও অভিজ্ঞান প্রদানের ক্ষমতা শুধু পোপেরই থাকবে—রাজার নয়। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরীর কাছেও তিনি তাঁর নির্দেশ পাঠালেন। এতে হেনরী ক্রুদ্ধ হয়ে পোপকে এক কড়া চিঠি লিখলেন। পোপও তাঁকে রাজপদ থেকে সরিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসবার আদেশ জারি করলেন। বিপদে পড়ে হেনরী কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরী যখন জার্মানী যাচ্ছিলেন, সেই সময় হেনরী অতি দীনহীন বেশে

ক্যানোসা নামক স্থানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন ও পোপের অনুগ্রহ ভিক্ষা করলেন। পোপ রাজার আনুগত্য চাইলেন, তিনি হেনরীকে ক্ষমা করলেন ও তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। চতুর্থ হেনরী সিংহাসন লাভ করে নিজমূর্তি ধারণ করলেন; পোপের নির্বাচিত রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি সমগ্র ফ্রান্সে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরী আবার তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলেন; কিন্তু এতে বিশেষ কিছু ফল হল না, কারণ চতুর্থ হেনরী এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন। ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরীর মৃত্যু হয়; কিন্তু অভিজ্ঞান সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। অনেকদিন ধরে রাজা ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে ওর্মসের এক সভায় এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল। জার্মান সম্রাটগণ ধর্মযাজকদের অভিজ্ঞান প্রদানের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। স্থির হয়েছিল যে গির্জার ধর্মযাজক নির্বাচনে রাজারা কোন অংশ গ্রহণ করবেন না; নির্বাচনের সময় তাঁরা শুধু উপস্থিত থাকবেন ও কোন বিরোধ উপস্থিত হলে তা মিটিয়ে দিবেন। এই মীমাংসায় পোপ বা রাজা কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরীর সময় (১১০০-১১৩৫ খ্রীঃ) অনুরূপভাবেই সমস্যার সমাধান হয়েছিল। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফিলিপ (১০৬০-১১০৮ খ্রীঃ) এই সমাধান মেনে নিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে পোপের ক্ষমতাই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী)

মঠ ও গির্জার বিদ্যালয়ঃ শার্লামেনের সাম্রাজ্যের পতনের পর নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার খুব অবনতি ঘটেছিল। যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হত তা প্রাচীন মঠ ও গির্জার স্কুলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষক, চাষী, মজুরদের ছেলেদের জন্য কোন ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাদের

বাড়ীতেই। এখানে শরীরচর্চা, সামরিক শিক্ষা, আইন ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হত। সর্বত্রই ল্যাটিন ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম।

একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। মঠ ও গির্জার বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ক্যান্টারবারী, লেয়ন, প্যারিস, রেইমস, চার্টার্স, টোলেডো প্রভৃতি ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল। এই সব বিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, গণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি লিবারাল আর্টস বা উদার বিষয়গুলি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি ঃ ইউনিভার্সিটি কথার অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার স্থান। মধ্যযুগের ইউরোপে পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব ছিল না। নানা দেশ থেকে অনেক ছাত্র এঁদের কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য সমবেত হত। কোন খোলা জায়গায়, গাছতলায় বা শিক্ষকের বাড়ীতে এই আলোচনা সভা বসত। শিক্ষকের কথাগুলি ছাত্রগণ লিখে নিত। ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল। ইতালীর বোলোগ্না শহরে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ক্রমে প্যারিস (১২০০ খ্রীঃ), সালের্নো, অক্সফোর্ড (১২০৯ খ্রীঃ) ও এরও কিছু পরে কেম্ব্রিজ, ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল। সাধারণ স্নাতক উপাধির জন্য চার বছর ও উচ্চতর উপাধির জন্য আরও তিন বছর পড়তে হত।

এই সময়ে অ্যানসেলেম, অ্যাবার্লাড প্রমুখ আরও অনেক শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গির্জার তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠেছিল। এখানকার ছাত্রগণই কাউন্সিলার বা সভ্য ও কাউন্সিলারগণ রেক্টার বা অধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। এখানে আইন-শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া

হত। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত বলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক ভালই ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত করার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ঃ আইন শাস্ত্র ঃ আইনকানুন শেখার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ইতালির বোলোগ্না শহরে। এখানকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ নবম শতাব্দীতেই সালের্নোতে চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় চিকিৎসকগণ গ্রীক ও আরবদের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছিলেন। নিজেরাও অনেক কিছু অনুশীলন করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানকার চিকিৎসা-কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র ঃ প্যারিস্ ছিল ন্যায়, তর্কশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনার প্রধান্ কেন্দ্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে অধ্যাপক অ্যাবার্লডের বক্তৃতা শুনতে হাজার হাজার ছাত্র সমবেত হত। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে এখানেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লিবারাল আর্টস ঃ মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা ও বাইবেলের শিক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হত। স্বাধীন উদার ভাবের শিক্ষাব্যবস্থা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল। লিবারাল আর্টসের বিষয়গুলি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন এই সময় আরম্ভ হয়েছিল। আরবদের সাথে যোগাযোগের ফলে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি ঘটেছিল ঃ গ্রীক ভাষায় লেখা অ্যারিস্টটলের সমস্ত রচনা আরবগণ অনুবাদ করেছিলেন। ইহুদিগণ ল্যাটিন ভাষায় এইগুলির অনুবাদ করে ইউরোপে প্রচার করেছিলেন। এই ভাবে গ্রীক ভাষায় লেখা বাইবেলেরও অনুবাদ করা হয়েছিল।

সাহিত্য ঃ মধ্যযুগে কোন জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। সে সময় ল্যাটিন ভাষা না শিখলে কোন লোককে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হত না। ল্যাটিন সাহিত্য, সাধুসন্তের জীবনী, কবিতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সবই

ছিল ল্যাটিন ভাষায়। এইগুলির যথেষ্ট অনুশীলন হয়েছিল। ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় বীরত্বের কাহিনী, ছোটদের গল্প, পরীর গল্প প্রভৃতি কিছু কিছু পুস্তক লিখিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। শার্লামেন কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান লেখ।

২। শার্লামেনের শাসন-ব্যবস্থা ও দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে তাঁর বিশেষ উদ্যোগের বিবরণ দাও।

৩। রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান কিভাবে এবং কার উদ্যোগে ঘটেছিল? কিভাবে ঘটেছিল?

৪। শার্লামেনের সাম্রাজ্যে মঠ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কিভাবে হত? সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ক্লানী সম্প্রদায় বলতে কি বোঝ? এদের আন্দোলনের কারণ কি? এই আন্দোলনের ফলাফল কি?

৬। ইনভেস্টিচার কাকে বলে? এই সম্পর্কে রাজা ও পোপের মধ্যে কি ভাবে বিরোধ ঘটেছিল?

৭। মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:

(ক) শার্লামেন কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে রাজ্য দখল করেছিলেন?
(খ) মঠ কাকে বলে?
(গ) সাধু বেনিডিক্ট কে ছিলেন?
(ঘ) গির্জা সংস্কারের কাজে সন্ন্যাসীদের কি ভূমিকা ছিল?
(ঙ) ক্লানী সম্প্রদায়ের অবদান কি?
(চ) লিবারাল আর্টস কাকে বলে।

৯। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা — ভাগে বিভক্ত ছিলেন।
(খ) রোমান ক্যাথলিক গির্জার ধর্মযাজকগণ — কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।
(গ) নবম শতাব্দীতে — চিকিৎসাবিদ্যার সূচনা হয়েছিল।
(ঘ) সম্রাট শার্লামেন — বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
(ঙ) শার্লামেনের রাজত্বের আগে — সম্রাটগণ রোমান সম্রাট বলে স্বীকৃত হতেন।

সপ্তম অধ্যায় | মধ্যযুগের ইউরোপে ফিউডাল প্রথা
ফিউডাল প্রথা
জমিদারী প্রথা

(ক) ফিউডাল প্রথা

নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউরোপের সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় খুব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। দেশের জমিদার, অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারিগণ এই সময় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলে তাঁরা দেশের বিশৃঙ্খলা দূর করতে পেরেছিলেন। এই নতুন ব্যবস্থাকেই ফিউডাল প্রথা বলা হয়। ৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ইউরোপে প্রচলিত ছিল।

ফিউডাল প্রথাকে এক রকম সামরিক জায়গীরদারী প্রথা বলা যেতে পারে; যার ফলে দেশের ভূমি বণ্টন, কর আদায়, শান্তিও শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারব্যবস্থা সবই এসে পড়েছিল মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রধান বা জায়গীরদারদের হাতে। দেশরক্ষা বা শাসনকার্য সব বিষয়ের কর্তা পূর্বে রাজাই ছিলেন। এখন রাজাকে আর এই দায়িত্ব পালন করতে হত না। রাজার পরিবর্তে সামন্তপ্রধান বা জায়গীরদারদের শাসনব্যবস্থাকে ফিউডাল প্রথা, সামন্তপ্রথা বা জায়গীরদার প্রথা বলে।

ফিউডাল প্রথার সূত্রপাত ঃ ইউরোপের নানা স্থানে নানা রকমের ফিউডাল প্রথা গড়ে উঠেছিল। বর্বর জাতির আক্রমণের সময় থেকে ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ কোন শক্তিশালী ব্যক্তির আশ্রয়ে এসে নিরাপদ হতে চাইত। স্বাভাবিকভাবেই আশ্রয়দাতা শক্তিশালী সামন্ত আশ্রয়ের পরিবর্তে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতেন। আর একভাবে এই প্রথার সূচনা হয়েছিল। এই সময়ে ইউরোপে অনেক জমিদারের জমিজমা ছিল খুব বেশী। অত জমি চাষ করার মত দাস বা মজুর তাঁর অধীনে ছিল না। বাধ্য হয়ে তাকে তাঁর সম্পত্তির কতক অংশ

তার চেয়ে ছোট জমিদারের কাছে বিলি করতে হয়েছিল। জমির পরিবর্তে তাকে বড় জমিদারের হুকুম মত অনেক কাজ করতে হত। এই কাজগুলির মধ্যে যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করাই ছিল প্রধান। আর এক রকমের প্রথা ছিল জার্মান সেনানায়কদের মধ্যে। যুদ্ধ করে এরা যে সব স্থান দখল করতেন, সেগুলি থেকে কিছু অংশ বিশ্বস্ত লোকদের ভাগ করে দিতেন। এখানেও এই শর্ত ছিল, যুদ্ধের সময় এরা সেনানায়কদের সাহায্য করবেন। ফ্রান্সে রাজাই ছিলেন রাজ্যের ভূসম্পত্তির মালিক। তিনি অধীনস্থ সামন্তপ্রধানদের মধ্যে যুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সাহায্যের বিনিময়ে জমিদারী বিলি করে দিতেন। বড় সামন্তগণ আবার ছোট সামন্তদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে জমিদারী বিলি করে দিতেন।

ফিউডাল প্রথার বৈশিষ্ট্যঃ ভূসম্পত্তি বা দেশের জমির মালিকানাই ফিউডাল প্রথার আসল কথা। সে সময় জমির ফসলই ছিল মানুষের সম্পত্তি। দেশের জমির মালিক হয়ে এক শ্রেণীর লোক দেশের শাসনব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বড় বড় জমিদার বা সামন্তগণই দেশের শাসনকর্তা হয়ে উঠেছিলেন। রাজার কাজ তাদের হাতেই চলে এসেছিল। ব্যক্তিগত লোকের হাতে শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তর হল ফিউডাল প্রথার প্রথম বৈশিষ্ট্য। রাজা বা কোন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আর ছিল না।

ফিউডাল প্রথার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা। বড় সামন্ত, জায়গীরদার বা জমিদার, জমি দান করতেন তাঁর চেয়ে ছোট জমিদারকে। যিনি জমি দান করলেন তিনি হলেন প্রভু বা লর্ড; আর যিনি জমি গ্রহণ করলেন, তিনি হলেন প্রজা বা ভ্যাসাল।

মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন হল এই প্রথার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। রাজাই হলেন দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি শর্তসাপেক্ষে জমি বিলি করলেন বড় সামন্তদের কাছে; তাঁরা আবার তাঁর অধীন জমিদারদের সম্পত্তি বিলি করলেন। ছোট জমিদারগণ জমিদারীর মালিক হয়ে সাধারণ চাষী ও সার্ফ দিয়ে জমি

চাষ করাতে শুরু করলেন। রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া বিচার করা, কর আদায় করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও সামন্ত ও জমিদারগণ গ্রহণ করছিলেন জমি লাভের বিনিময়ে।

শর্ত পাকা করার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান দ্বারা এই জমি বা জমিদারী আদান-প্রদান হত। অনুষ্ঠানের সময় 'ভ্যাসাল' প্রভুর কাছে খোলা মাথায় সমস্ত শর্ত আজীবন পালন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করতেন। প্রভুও প্রজাকে আশ্রয় দিতেন, বিনা কারণে তাঁকে বা তাঁর বংশের লোককে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিতেন।

ফিউডাল শাসনব্যবস্থা: খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে যেমন স্তরবিন্যাস ছিল, ফিউডাল প্রথায়ও তেমনি সামন্তদের মধ্যে স্তর-বিন্যাস ছিল। খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপই হলেন ধর্মজগতের সর্বেসর্বা। তাঁর অধীনে থাকতেন বিশপ, আর্চবিশপগণ, আর তার নীচে থাকতেন গ্রামের গির্জার ধর্মযাজক বা পুরোহিতগণ। সকলেই ওপরওয়ালার হুকুম মেনে চলতেন। ফিউডাল প্রথার প্রধান বা সর্বময় কর্তা হলেন রাজা বা খুব বড় সামন্ত। এঁরাই হলেন দেশের সব জমির মালিক। রাজা বা সামন্ত জমিদারী ভাগ করে দিতেন তাঁর চেয়ে ছোট সামন্তদের। এই সামন্তগণ আবার তাঁদের অধীন সামন্তদের জমি ভাগ করে দিতেন। এঁরা নিজ নিজ এলাকায় মজুর ও সার্ফদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন; আর কিছু জমি দিতেন চাষ করার জন্য। উপরের স্তরের সামন্তগণ বা রাজা নীচের সামন্তদের রক্ষা করার দায়িত্ব দিতেন, আর ছোট সামন্তগণ চাষী, কৃষক, মজুর, সার্ফ সকলের রক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করতেন।

ফিউডাল প্রথা চালু হওয়ার ফলে দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে জায়গীরদার বা সামন্তপ্রধানগণ নিজ নিজ এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধীদের বিচার করা,

গির্জা ও ধর্মযাজক নিয়োগ করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সবই চলে গিয়েছিল এই সামন্তপ্রধানদের হাতে। কর আদায়, অন্য কাজের জন্য জরিমানা সবই এরা করতেন। রাজার সাথে সাধারণ লোকের কোন সম্বন্ধ ছিল না বললেই হয়।

এই সামন্তপ্রধানগণ পূর্বে রাজার অধীনে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতেন। কেউ ছিলেন রাজার মন্ত্রণা সভার সভ্য, কেউ বা বিচারক, কেউ কেউ কর আদায় করতেন। শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভারও তাঁদের হাতেই ছিল। পূর্বে রাজার কর্মচারীরূপে তাঁরা এই কাজগুলি করতেন, ফিউডাল প্রথা চালু হবার পর রাজার কর্তৃত্ব আর ছিল না।

অধীনস্থ প্রজার কর্তব্য ঃ সামন্তপ্রধানগণের প্রধান কাজ ছিল রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। তাঁরা নিজেরা এই সৈন্যবাহিনী রাখতেন না; তাঁরা নিজেদের অধীনস্থ সামন্তদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতেন। তা ছাড়া রাজকার্যের নানা বিষয়ে, যেমন, বিচার করা কর আদায় করা প্রভৃতি কাজও তাঁদের করতে হত। রাজার হুকুম হলে তাঁদের রাজদরবারে আসতে হত। এছাড়া সামন্তগণের নিজের চাষ আবাদের জন্য কিছু জমি থাকত। এগুলি তাঁরা নিজেরা চাষ করতেন না, তাঁর অধীনস্থ প্রজা বা সার্ফরাই বিনা মজুরিতে এই জমিগুলি চাষ করত।

সামন্ত প্রথায় গির্জার স্থান ঃ গির্জার ধর্মযাজকগণকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে আসতে হয়েছিল। তাঁরাও রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। বড় বড় রাজা বা সামন্তগণ গির্জায় অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। ধর্মযাজকগণ সাধারণ সামন্তগণের মত সব আইনকানুন মেনে চলতেন। তবে তাঁরা নিজের হাতে জমি চাষ করতেন না। একাজ সার্ফদের দিয়েই করান হত; কিন্তু রাজার হয়ে যুদ্ধে যেতে তাঁদের সম্মানে বাধতো না।

অন্যান্য করের বোঝা ঃ সাধারণ শর্ত ছাড়া রাজা ও সামন্ত প্রধানগণ মাঝে মাঝে অন্যায়ভাবে নানা রূপ কর আদায় করতেন।

দেশ ভেদে এই করগুলি ভিন্ন প্রকারের ছিল। কোন জমিদার বা সামন্তের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীরা যখন তাঁদের সম্পত্তির মালিক হতেন তখন সামন্তপ্রধানকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হত। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রী নতুন বিয়ে করলেও এই কর দিতে হত। তা ছাড়া আর তিনটি কর ছিল। এগুলি অধীনস্থ সব প্রজাকেই দিতে হত। প্রথমটি হল রাজার প্রথম ছেলে যখন নাইট বা বীর হতেন; দ্বিতীয়টি হল রাজার প্রথম মেয়ের বিয়ের সময় এঁদের অর্থ দিতে হত। আর তৃতীয়টি হল কোন যুদ্ধে রাজা বা সামন্ত বন্দী হলে তাঁকে মুক্ত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে তা অধীনস্থ প্রজার দেয় বলে গণ্য করা হত।

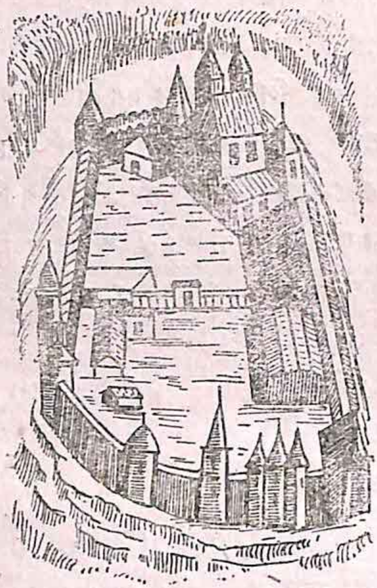
সামন্ত প্রথা অনেক দিন ধরে প্রচলিত ছিল। সমগ্র ইউরোপে ফিউডাল প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল।

ক্যাসেল বা দুর্গ: ফিউডাল প্রধানকে বলা হত কাউন্ট, ডিউক বা ব্যারন। তাদের বাড়ী বা বাসস্থানই হল ক্যাসেল (Castle) বা দুর্গ। রাজপ্রাসাদের মত জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও এগুলি খুব সুরক্ষিত ছিল। বাড়ীগুলি প্রথম দিকে কাঠ দিয়ে তৈরী হত। তারপর বড় বড় পাথরের দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল। কোন কোন দুর্গ দোতলা, তিনতলাও ছিল। এর চার পাশে ছোট ছোট সামন্ত কর্মচারী, গির্জা ও গির্জার পুরোহিতগণের থাকবার ঘর ছিল।

বাইরের শত্রু সহজে এসে যাতে দুর্গ আক্রমণ না করতে পারে তার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাধারণতঃ কোন পাহাড়ের উপর, কোন উঁচু জায়গায় বা নদীর ধারে দুর্গগুলি নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের বাহিরে চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। তার চার পাশে আবার গভীর খাল কেটে একে আরও নিরাপদ করা হত। ক্যাসেলের ভিতরে যাবার একটি মাত্র পথ ছিল। ব্রীজ বা সাঁকোর উপর দিয়ে ছাড়া দুর্গে ঢোকার কোন উপায় ছিল না। দুর্গে প্রহরী ও অস্ত্রশস্ত্রও রাখা হত।

দুর্গে সামন্তপ্রধানদের দরবার, দপ্তরখানা ও কর্মচারীদের কাজ

করার স্থান ছিল। অস্ত্রাগারও ছিল দুর্গের ভিতরেই। প্রধানদের থাকার ঘর, রান্নাঘর ও সাজসরঞ্জাম রাখার ঘর, দুর্গের মধ্যেই থাকত। দেহরক্ষীদের থাকার ঘর, ঘোড়ার আস্তাবল প্রভৃতি দুর্গের চারপাশে থাকত। দুর্গ-প্রধানরা ধনী সম্প্রদায়ের লোক; এদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিতে প্রচুর খরচ হত। অতিথি-অভ্যাগত প্রায়ই আসত; আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। সামন্তগণ সৈনিকের পোশাক পরত, তাদের হাতে থাকত — ঢাল, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র। ঘোড়ায় চড়তে তারা খুবই পটু ছিল। শিকারে যাওয়া তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামন্তদের সাথে এদের ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকত। এরা নিজের মর্যাদা ও শৌর্য-বীর্যের জন্য গৌরব বোধ করত। এর ফলেই ইউরোপে নোবল বা অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের বীর বা নাইটগণ সবাই এই অভিজাত বংশেরই লোক। ভদ্রতা, বিনয় ও নম্র ব্যবহার, পরোপকার, আনুগত্য প্রভৃতি নানা সদগুণও এই নাইট বা বীরদের মধ্যে ছিল। সেকালের দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধীর দণ্ডবিধান, গির্জার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সব কাজ এই নোবেলদের হাতেই ছিল।



সামন্তদের দুর্গ

বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে ইউরোপ রক্ষা: ফিউডাল প্রধানগণ রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধযাত্রা করে বীরের মত যুদ্ধে প্রাণ দিতেও তাঁরা ভয় পেতেন না। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এঁদের প্রধান সহায় ছিল। ক্যাসেলে ভাল ঘোড়া

রাখা হত। এদের অনেকগুলি আনা হত বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য থেকে। সমগ্র ইউরোপ যখন মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন এই অশ্বারোহী সৈন্যগণই ইউরোপ রক্ষা করেছিল। চার্লস মার্টেলের সৈন্যবাহিনী প্রথমে ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পয়িটিয়ার্সের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করে আরবদের হাত থেকে ইউরোপ রক্ষা করেছিলেন। এই সময় থেকে অশ্বারোহী সৈন্যের গুরুত্ব বেড়ে যায়। যে সামন্ত যত বেশী অশ্বারোহী সৈন্য যোগাতে পারতেন তাঁকে তত বেশী জায়গীর দেওয়া হত।

মধ্যযুগের জীবনের বৃত্তি হিসাবে ফিউডাল প্রথা ঃ মধ্যযুগের ইউরোপে ধনী বা নোবল বংশের ছেলেরা যোদ্ধা রূপেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করত। লেখাপড়ার প্রচলন শুধু ধর্মপ্রচারকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু যুদ্ধবিদ্যাই নয়, আচার-ব্যবহার, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, কর্তব্য বোধ, দেশ সেবা এসবও নোবলদের আচরণের অঙ্গ ছিল। ধর্মযাজকগণও এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন।



অশ্বপৃষ্ঠে নাইট

প্রথম দিকে নাটইগণ নিজেরাই যুদ্ধবিদ্যা শিখতেন। ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র চালনা প্রভৃতি নিজেদেরই শিখে নিতে হত। ক্রমশঃ এই শিক্ষাব্যবস্থা একটা বিশিষ্ট রূপ নেয়।

সাত বছর বয়সে সাধারণতঃ নোবল বংশের ছেলেরা কোন দরবারে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকত। সেখানেই তাদের থাকতে হত। গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বাড়ীর চাকরের সব কাজই তাকে করতে হত। কিছুদিন পরেঃ তাকে সামান্য লেখাপড়া, ভদ্র ব্যবহার,

কথাবার্তা বলার রীতি, গুরুজনদের সম্মান করা প্রভৃতি শেখান হত। এই ভাবে সাত বছর কাটানোর পর চৌদ্দ বছর বয়সে ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, অস্ত্র চালনা প্রভৃতি শেখান আরম্ভ হত। তা ছাড়া সঙ্গীতবিদ্যা, দাবা খেলা প্রভৃতিও শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করা হত। একুশ বছর বয়সে এই শিক্ষা শেষ হত। শিক্ষা শেষে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। কোন গির্জায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল। শিক্ষানবীশ নাইটকে গির্জায় গিয়ে থাকতে হত এবং সেখানেই তাকে রাত কাটাতে হত। সকালে স্নান করে সাদা পোশাক পরে সে গির্জার প্রার্থনায় যোগ দিত। এরপর গির্জায় পুরোহিত পবিত্র তরবারি প্রদান করতেন। কোন প্রবীণ নাইট শিক্ষানবীশ নাইটের ঘাড়ে একটি ঘুষি মারতেন অথবা তরবারির উল্টো দিক দিয়ে তাকে আঘাত করতেন। এর পর শিক্ষানবীশ নিজেকে নাইট বলে দাবী করতে পারত। নাইট হওয়ার সময় শিক্ষানবীশকে কিছু উপদেশও দেওয়া হত—যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে, দুর্বল অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করবে, কোন অন্যায় আচরণ করবে না, কোন অর্থলাভের আশা না করে নিজের জীবন দিয়ে দেশ রক্ষা করবে ও নীচতা, কাপুরুষতা প্রভৃতি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে।



মধ্যযুগের নাইট

মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটগণের অবদান সামান্য ছিল না। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে দেশে যখন কোন ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন না সেই সময় দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গির্জা

ও খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষার কাজে নাইটগণ এগিয়ে এসেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে স্পেনের সাথে যুদ্ধের সময় অনেক ফরাসী নাইট প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে নাইটদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধ করাই ছিল নাইটদের জীবনের প্রধান কাজ। শান্তির সময় এঁরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মহড়া দিতেন বা কৌতুকের লড়াই করে দেশের লোককে আনন্দ দিতেন।

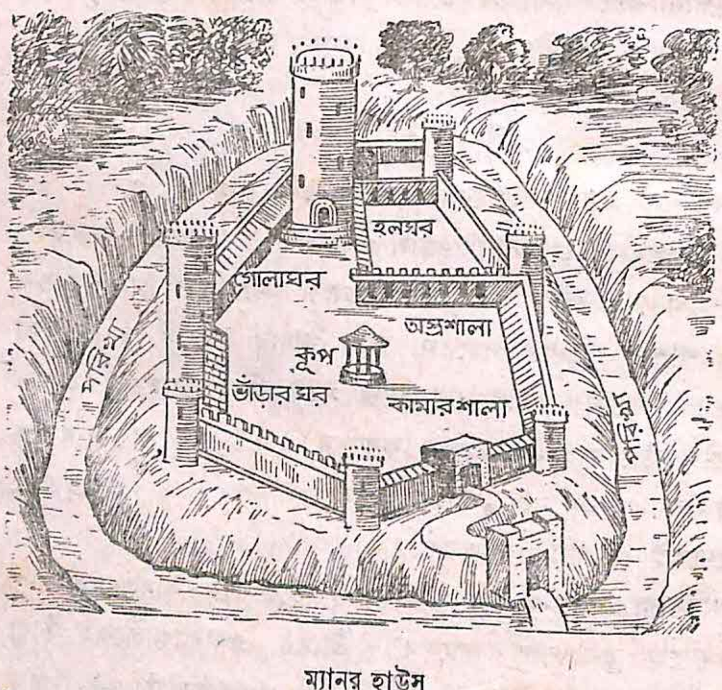
চারণ কবি বা গায়কগণঃ নাইটদের বীরত্ব-কাহিনী সেকালের ইউরোপীয় জনসাধারণের উপভোগের বিষয় ছিল। দেশীয় ভাষায় নাইটদের বীরত্ব-কাহিনী রচিত হত এবং কবিতা ও গানের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে এগুলি প্রচার করা হত। দেব-দেবীর নানা কাহিনী, বড় বড় বীরদের বীরত্ব গাথা, স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মান দেখান প্রভৃতি কাহিনী রচনা করে চারণ কবি বা গায়কগণ দেশে দেশে গান করতেন। এই চারণ কবি ও গায়কদের ট্রাউবেডুর বলা হত। ফ্রান্স ও জার্মানীতে এই ধরনের অনেক গায়ক ছিলেন।

(খ) জমিদারী প্রথা

ফিউডাল প্রথার অর্থনৈতিক দিক হল জমিদারী প্রথা। এই ম্যানর বা জমিদারী থেকেই ফিউডাল প্রধানগণ অর্থ সংগ্রহ করতেন। সামন্ত-প্রধানদের জীবন ছিল বিলাসবহুল। তাঁরা দুর্গে বাস করতেন, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন, ভাল খাবার খেতেন ও দেহরক্ষী রাখতেন। অস্ত্রশস্ত্র, অশ্বারোহী সৈন্য সবই ছিল তাঁদের। অনেক কর্মচারীও তাঁদের অধীনে কাজ করতেন। এই সব ব্যবস্থা করতে তাঁদের খরচ কম হত না। তাঁরা অধীনস্থ সামন্ত ও চাষী মজুরদের কাছ থেকেই এই অর্থ আদায় করতেন।

জমিদারীঃ সামন্ত-প্রধান তাঁদের চেয়ে বড় সামন্ত-প্রধানদের কাছ থেকে ভূ-সম্পত্তি পেতেন। তাঁদের এলাকাগুলিকেই তাঁরা তাঁদের জমিদারীতে পরিণত করেছিলেন। এখানে তাঁদের নিজস্ব কিছু জমি থাকত যাকে খাস খামার বলা যেতে পারে। এখানকার

ফসল তাঁরাই পেতেন। জমিদারীতে থাকত কাছারী বাড়ী, দপ্তরখানা, কর আদায়ের লোক ও বিচারকগণের থাকার ঘর। গীর্জা ও পুরোহিতদের থাকার জন্যও ঘরবাড়ী থাকত। জমিদারীর জমিগুলি চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। চাষী ছিল দু ধরনের। কিছু চাষী জমিদারের কাছে জমি নিয়ে নিজেরাই চাষ করত। এদের বলা হত স্বাধীন চাষী। আর বেশীর ভাগ জমি চাষ করানো হত সার্ফদের দিয়ে। এদের চাষের এলাকা ভাগ করা থাকত; কিন্তু নিজস্ব কোন জমি থাকতো না। এ ছাড়া জমিদারীর মধ্যে বন, জলাশয়, ঘাসের জমি, রুটির কারখানা, মদের কারখানা সব কিছুর মালিক ছিলেন জমিদার। এক একটা ম্যানরে হাজার, দু হাজার একর জমি থাকত। কোন কোন সামন্ত-প্রধানের একাধিক জমিদারীও থাকত। জমিদারীর মধ্যে থাকত অনেক ছোট ছোট



ম্যানর হাউস

গ্রাম। চাষী মজুর বা সার্ফগণ এই গ্রামেই বাস করত। চালাঘরেই তারা বাস করত। জমিদারীর এলাকা ছেড়ে তাদের বড় বেশী

কোথাও যাবার দরকার হত না। জীবন-যাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু জমিদারীর মধ্যেই পাওয়া যেত। চাষীদের বাড়ীর সামনে কিছু খালি জমি থাকতো। সেখানে তারা শাকসব্জী আবাদ করতো। ফিউডাল সামন্তগণের গ্রামীণ কেন্দ্র ছিল জমিদারী।

জমিদার তাঁর কাছারী বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর কর্মচারীদের সাহায্যে প্রজাদের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য আদায় করে নিতেন। নানা রকমের কর আদায় করা হত। প্রজাদের জমির উপর কর ছাড়াও বন থেকে কাঠ নেওয়া, রুটির কারখানা থেকে রুটি নেওয়া, মদের কারখানা থেকে মদ কেনা ছিল বাধ্যতামূলক। এইগুলি থেকে জমিদারের প্রচুর আয় হত। খাস খামার থেকে তাঁর প্রচুর আয় হত, কারণ এর জন্য তাঁকে কিছু খরচ করতে হত না। সার্ফগণই বিনা মজুরীতে জমিদারের খাস খামারে চাষ আবাদের কাজ করত।

ফিউডাল বিচারালয়ঃ জমিদারীর মধ্যে একটি করে বিচারালয় থাকত। গ্রামের সব লোককেই বিচারালয়ে আসতে হত। জমিদারী বাড়ীর হলঘরে, গীর্জার হলঘরে, অথবা কোন গাছ তলায় এই বিচারালয় বসত। জমিদার ও চাষীদের মধ্যে জমির অধিকার নিয়ে গোলমাল বাঁধত। চাষীরা তাদের অধিকারের চেয়ে বেশী কিছু করলে অন্যায় বলে গণ্য করা হত। বিচারের রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারের পক্ষেই যেত। তা ছাড়া চাষীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীকেও অর্থ দণ্ড দিতে হত। এই অর্থ জমিদারের তহবিলেই যেত।

জমিদারী প্রথায় চাষীর অবস্থাঃ ম্যানরে বা জমিদারীতে বসবাসকারী চাষীদের জীবন ছিল দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ। চাষ করে তারা যে ফসল পেত তার অর্ধেক যেত জমিদার আর গির্জার বিশপের খাজনা দিতে। চাষের ব্যবস্থা সে কালে খুব উন্নত ছিল না। কাঠের হাল তাতে ছোট লোহার ফলা লাগানো থাকত। ক্ষীণ ও দুর্বল বলদগুলির পক্ষে লাঙ্গল টানা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। জমিতে—সার

দেওয়ার প্রথা তখনও চালু হয় নি। তাই জমিতে ফসলও খুব সামান্যই হত।

সমবায় প্রথায় চাষ আবাদঃ গ্রামের সব চাষীরা মিলে এক সাথে চাষ আবাদ, অর্থাৎ জমিতে চাষ করা, ফসল বোনা ও ফসল কাটার কাজ করত। চাষীদের মধ্যে কাজের ভাগ করে দেওয়া হত। কতক চাষী গরু-বাছুরের দেখাশোনা করত, কতক চাষী ফসল দেখাশোনা করত। গোচারণ ভূমি দেখাশোনার জন্যও লোক ছিল। প্রত্যেক চাষীর আবাদ করার জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। জমিগুলি মাঠের বিভিন্ন জায়গায় থাকত; কেউ যাতে খুব ভাল জমি না পায় সেজন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেকের জমি সামান্য আল দিয়ে দাগ দেওয়া থাকত। খোলা মাঠেই চাষ আবাদ করা হত বলে একে বলা হত খোলা মাঠের চাষ প্রথা। তা ছাড়া চাষের সুবিধার জন্য সমস্ত জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হত। প্রথম ভাগে এক বছর কোন চাষ আবাদ হত না, দ্বিতীয় ভাগে চাষ হত বসন্তকালে আর কাটা হত গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে। এই জমিগুলিতে যব, রাই (rye), ওট, বীন ও মটর ইত্যাদি ফলতো। বাকী জমিতে শরৎকালে গম ও রাই বোনা হত, আর কাটা হত গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে। এক বছর পতিত থাকার ফলে জমির উর্বরতা কিছু বাড়তো। তা ছাড়া সব জমিতে একই সঙ্গে চাষ করা হত না বলে শ্রমেরও কিছু লাঘব হত।

এইভাবে ফসল যে খুব বেশী হত তা নয়, পরিশ্রম করতে হত খুব বেশী। জমিদারের খাস খামার ও গীর্জার জমিতেও তাদের চাষ আবাদ করতে হত। ফসল বোনার সময় জমিদার বাড়ীতে জমিচাষের কাজের জন্য চাষীর ডাক পড়ত। নিজের জমির চাষ পড়ে থাকতো। চাষীর স্ত্রীপুত্রদেরও চাষে অংশ গ্রহণ করতে হত।

মধ্যযুগের চাষীদের জীবনযাত্রাঃ মধ্যযুগে চাষীদের অবস্থা মোটেই সুখের ছিল না। পনের-কুড়ি মাইল বিস্তৃত থাকত একটা জমিদারী। মাঝে মাঝে থাকত চাষীর গ্রাম। গ্রামগুলি ছোট, প্রতি পরিবারের জন্য কয়েকটি চালা ঘর। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় এই ঘরগুলিতে

সব চাষী পরিবারকে কাটাতে হত। ঘরগুলিতে জানালা না থাকায় আলো, বাতাস আসতে পারতো না। রাতে অন্ধকারেই কাটাতে হত চাষীদের। আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। মোমবাতির দাম ছিল খুব বেশী। জমিদার ও গির্জার প্রভুরাই এগুলি ব্যবহার করতে পারতেন; চাষী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করত; ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল না। আলোর দরকার সেজন্য খুব কমই হত। বাড়ীতে আসবাব বলতে একটি কাঠের বাক্স; এর উপরে খড় বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হত। এতেই চাষীরা ঘুমাত, দু একটি কাঠের টেবিল, লোহার পাত্র, কিছু মাটির বাসনকোসন এই ছিল চাষীর সম্পত্তি। ঘোড়া, গরু, ছাগল, বেড়াল, কুকুর সবাইকে চাষীর বাড়ীর ভেতরেই স্থান দিতে হত।

খাদ্য ঃ গরমের সময় ঘরের বাইরে চাষী-বৌ রান্না করত। বাড়ীর সামনে সামান্য খালি জায়গায় যে জমি থাকত তাতে কিছু শাক-সব্জী ফলত। গম বদল দিয়ে জমিদারের কারখানা থেকে রুটি তৈরি করে নিতে হত। মাছ-মাংস এদের ভাগ্যে কমই জুটত। দুধ, রুটি, মাখন ছিল চাষীদের প্রিয় খাদ্য। কোন কোন সময় মদ ও বিয়ার খেত চাষীরা। মুরগীর মাংস, আর সাদা আটার রুটি এদের ভাগ্যে কদাচিৎ জুটত। এগুলি ছিল বড়লোকদের খাদ্য।

আনন্দ উৎসব ঃ রবিবার বা কোন সাধু-সন্তের জন্মদিনে ছুটি থাকত। এই সব দিনে চাষী-পরিবার কোন মেলায় বা বাজারে গিয়ে আনন্দ উৎসবে যোগ দিত। কোন কোন সময় গ্রামের কথকরা এসে তাদের গান বা কাহিনী শোনাত। ভালুকের নাচও দেখাতে আসতো কোন কোন সময়। কোন কোন ছুটির দিনে এরা জমিদারের বা গির্জার হলে আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করে আনন্দ করত। উৎসব-অনুষ্ঠানে জমিদারগণ কোন কোন সময় চাষীদের খাওয়াতেন।

কর ভার ঃ কর ভার চাষীর জীবনকে দুঃখময় করে তুলেছিল। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সে যা পেত তার বেশীর ভাগ খরচ হয়ে যেত নানা রকম কর দিতে। চাষীদের উপর করের ভার ছিল খুব

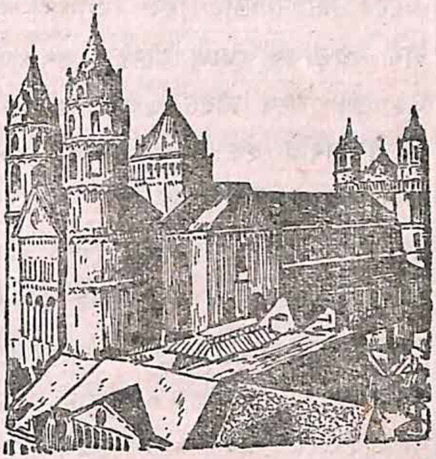
বেশী।) মাথাপিছু কর প্রত্যেক চাষীকে দিতে হত। চাষের জমির উপরও কর ছিল। জমির পরিমাণের উপর এটা নির্ভর করত। একে বলা হত "ট্যালেজ"। গির্জার জন্য প্রত্যেক চাষীকে যে কর দিতে হত তার নাম 'টাইথ'। তা ছাড়া জমিদারকে কলকারখানা প্রভৃতির জন্যও কর দিতে হত। উৎসব আনন্দের সময় উপহার উপঢৌকন দেওয়াও ছিল বাধ্যতামূলক। এই সব কর মিটিয়ে যা থাকতো তা দিয়েই চাষীকে জীবন যাপন করতে হত। চারণ ভূমি, বন, জলাশয় সব কিছুর জন্যই কর দিতে হত। ফসলই দেওয়া হত কর স্বরূপ; টাকাপয়সা দিয়েও কর দেওয়ার প্রচলন ছিল।

দুর্গের মধ্যে জমিদারদের জীবনযাত্রা ঃ ফিউডাল সামন্ত-প্রধানদের দুর্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। সামন্ত প্রধানগণ কখনও কখনও তাঁদের জমিদারীতে এসে বাস করতেন। সামন্ত ছোট হলেও তাঁর দুর্গ বা ক্যাসেল ছোট থাকতো না। জমিদারীর মধ্যেই এঁদের আবাসগৃহও থাকতো। এখান থেকেই তাঁরা জমিদারী শাসন করতেন। দুর্গের মত বিশাল না হলেও বাড়ীগুলি খুব খারাপ ছিল না। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গায় দোতালা, তিনতালা বাড়ী তৈরি করা হত জমিদারদের থাকার জন্য। নিচের তলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও অন্যান্য আসবাব থাকত। উপর তলায় জমিদারের থাকার ঘর ছিল। ঘর গরম রাখার জন্য আগুনের চুল্লীর ব্যবস্থাও ছিল। চাকর-বাকর, ছেলে-মেয়েদের জন্য দোতালাতেই পৃথক ঘর ছিল। আসবাবের মধ্যে কয়েকখানা টেবিল, চেয়ার, টুল ও বেঞ্চ ছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক উন্নত ছিল।

গির্জা ঃ গ্রামের পাশেই থাকত গির্জা। এর কাছাকাছি থাকত ধর্মযাজকের বাড়ী। এ বাড়ীগুলি বেশ ভালই ছিল। তাঁদের জমিজমাও ছিল প্রচুর; আয়ও ভালই ছিল। তাঁদের বিত্তবান বা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে।

কৃষক ও মজুর ঃ এর পরেই ছিল চাষীদের পর্ণ কুটীরের ছোট

ছোট গ্রাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করেও এদের দুবেলা অন্ন জুটতো না। অথচ এদের পরিশ্রমের ফলে জমিদারীর যা কিছু সম্পদ গড়ে উঠেছিল।



গীর্জা

মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ঃ মধ্যযুগের ফিউডাল সমাজে তিন শ্রেণীর লোক বাস করত। প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যায় ধর্মযাজক শ্রেণী বা পুরোহিত সম্প্রদায়কে। এঁরা কিছু লেখাপড়া শিখতেন। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এঁদের ছাড়া হতে পারতো না। তাই সমাজে এঁদের সম্মানও ছিল খুব বেশী। এঁদের কোন পরিশ্রমের কাজ করতে হত না; অথচ এঁদের আয়ও ছিল যথেষ্ট। এঁরা কোন দায়িত্ব না নিয়েই সুখে দিন কাটাতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে জমিদার, সামন্ত-প্রধান প্রভৃতির কথা। এরা বংশানুক্রমিক ভাবে ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এঁরা লেখাপড়া শিখতেন খুব সামান্যই, তবে যুদ্ধবিদ্যা এঁদের শিখতেই হত; নাইট হয়ে বীরত্ব দেখাতেন। দেশ শাসনের ভার ছিল এঁদের হাতেই। যুদ্ধ বাধলে এঁদের এগিয়ে আসতে হত। খুব সুখেই এঁরা দিন কাটাতেন।

এর পরই আর যারা—অর্থাৎ সমাজের বেশীর ভাগ লোক চাষী, মজুর, সার্ফ, সবাই হল তৃতীয় শ্রেণীর লোক। এরা দরিদ্র, অবহেলিত ও ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ চাষীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। নাগরিক অধিকারও এরা পেত না। জমিদারীর মধ্যে জমিদার তাঁর আত্মীয়-পরিজন, কর্মচারী, গির্জার পুরোহিত, চাষী সবাই পাশাপাশি বাস

করতেন এবং এঁরা সকলেই একই ধর্মের লোক ছিলেন। কিন্তু এঁদের জীবনযাত্রায় ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কৃষক, মজুর, চাষী প্রভৃতির ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত না। যুদ্ধবিদ্যা শিখে নাইট হবার কল্পনাও করতে পারতো না। চাষীর ছেলে চাষীই হত। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা করাও এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের কাছে এরা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। এ ব্যবস্থা তারা মেনে নিয়েছিল ভগবানের বিধান বলে। ভগবানই একজনকে ধনী আর একজনকে দরিদ্র করেছেন। এই শিক্ষাই তারা পেয়েছিল খৃষ্টান পুরোহিতদের কাছ থেকে।

সার্ফ : সার্ফ বলতে রোমান সাম্রাজ্যের দাসদের কথা মনে হয়। দাসদের চেয়ে সার্ফদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। অথচ এরাই ছিল ফিউডাল প্রথার মেরুদণ্ড।

বংশানুক্রমিক ভাবে অবহেলিত ও ঘৃণিত কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে সার্ফ বলা হত। গরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগীর মত এরাও ছিল প্রভুর স্থাবর সম্পত্তি। জমির সাথেই ছিল এদের যোগাযোগ। জমিদারীর মালিকের পরিবর্তন হলে এদেরও মালিকের পরিবর্তন হত। কোন কোন সময় এদের বিক্রি করাও হত। কোন নাগরিক অধিকার এদের ছিল না। একজন সার্ফের সাথে আর একজন সার্ফের বিরোধ হলে সে জমিদারের কাছে নালিশ করতে পারত। কিন্তু কোন স্বাধীন চাষীর বিরুদ্ধে নালিশ করার অধিকার তার ছিল না। নোবল বা অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তো কথাই ওঠে না। জমিদারীর বাইরে গেলে তাকে প্রভুর হুকুম নিতে হত। চাষের জন্য তাকে কিছু জমি দেওয়া হত; কিন্তু সে শুধু চাষেরই মালিক, জমির মালিক জমিদার। তা ছাড়া ঐ জমির জন্য তাকে কর দিতে হত।

জমিদারের খাস খামারে সার্ফকে সপ্তাহে তিন দিন কাজ করতে হত। কোন কোন সময় গির্জার জমিতেও তাকে চাষ আবাদ করতে হত। এ কাজের কোন মজুরী ছিল না, অথচ এ কাজ করা তার অবশ্য

কর্তব্য বলে গণ্য হত। চাষের মরশুমে কাজের সময় আরও বাড়ত। তার নিজের জমিতে চাষ হোক আর নাই হোক প্রভুর জমিতে চাষ তাকে আগেই করতে হত। এজন্য চাষের ক্ষতি হত। স্ত্রী-পুত্রকে দিয়ে নিজের জমির চাষ আবাদ করতে হত। জমিদারীর ভিতর রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত, নদীর পুল তৈরির কাজও ছিল বাধ্যতামূলক। এজন্য অনেক সময় তাকে বাড়ী থেকে দূরে যেতে হত। কোন কোন সময় দরকার হলে তাকে যুদ্ধে যেতে হত। কতদিন পরে সে বাড়ীতে ফিরবে তার ঠিক ছিল না। অবশ্য যুদ্ধের কাজে সার্ফদের কমই নেওয়া হত; কারণ তারা যুদ্ধ করতে জানতো না। এ ছাড়া প্রভুর সংসারের কাজ করাও এদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। প্রভুর এলাকার রুটির কারখানা, কামারশালা, জলের কল চালান প্রভৃতি কাজের জন্য সার্ফদের ডাক পড়ত। প্রভুর হুকুম শোনা ছাড়া এদের উপায় ছিল না।

সার্ফদের ছেলে-মেয়েরাও সার্ফই হত। প্রভুর জমি ছেড়ে এরা যেমন যেতে পারতো না, নিজেদের জমি থেকে এদের তাড়ানোও যেত না। তাই চাকরী যাওয়ার ভয় তাদের ছিল না। ছেলে-মেয়েদের কোন গির্জায় লেখাপড়া শেখানোর জন্য পাঠাতে হলে, বা কোন বৃত্তিমূলক কাজ যেমন দর্জির কাজ, কামার বা কুমোরের কাজ শেখার জন্য অন্যত্র পাঠাতে হলে প্রভুর হুকুম নিতে হত এবং এর জন্য অর্থ দণ্ড দিতে হত। প্রভুর হুকুম ছাড়া বিয়ে করাও চলত না।

সার্ফ ছাড়া জমিদারদের চলত না। তাই এদের উপর খুব নির্মম ব্যবহার করা হত না। এদের বাঁচিয়ে রাখা হত জমিদারের স্বার্থেই। তাই এদের খাবার জুটত, থাকবার স্থানও ছিল, যদিও সে স্থান অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর। কোন কোন জমিদারের দয়া-মায়াও ছিল।

সার্ফদের মুক্তির উপায়ঃ সার্ফদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী পড়ে মনে হতে পারে কেন তারা এই অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করেছিল। কেন বিদ্রোহ করেনি? তার কারণ এরা সবাই ছিল খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন তারা মেনে চলত। অন্যায় করলে, শর্ত ভঙ্গ করলে পর জীবনে তারা কষ্ট ভোগ করবে এই ছিল তাদের ধারণা।

তারা সবাই ছিল নিরক্ষর, তাই নির্বিচারে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলত। খ্রীষ্টধর্মে মানুষের মহত্ত্বের কথা, দয়া, মায়া, পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গির্জার কোন ধর্মযাজক সার্ফদের মুক্তির জন্য সাহায্য করেন নি, কারণ সার্ফ তাদেরও খুব প্রয়োজন ছিল। কোন সহৃদয় নাইট বা নোবলও এদের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন নি। সার্ফগণ নিজেরাই তাদের মুক্তির উপায় বের করে নিয়েছিল।

সার্ফ জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার আইনসম্মত পথ ছিল কোন গির্জা বা মঠে যোগ দেওয়া। এতেও প্রভুর হুকুম দরকার হত, অর্থদণ্ডও দিতে হত। টাকা পেলে প্রভুও তাদের ছেড়ে দিতে আপত্তি করতেন না।

প্রভুর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় সার্ফগণ পালিয়ে শহরে আশ্রয় নিত। তখন ইউরোপে অনেক নূতন শহর গড়ে উঠছিল। সেখানে আশ্রয় পাওয়া কষ্টকর ছিল না। দৈনিক মজুরীতে কাজও জুটে যেত। নূতন শহর তৈরী করতে হলে অনেক লোকের দরকার হত। জঙ্গল কাটা, মাটি কাটা ইত্যাদির কাজ পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হত না।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নূতন নূতন শহর গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কাজের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই সব কাজের জন্য অনেক লোহার দরকার হত। শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় শিক্ষানবীশ নেওয়া হত। তাদের খাওয়া ও থাকার স্থান দেওয়া হত, কিন্তু শিক্ষানবীশ কালে কোন মজুরি দেওয়া হত না। শিক্ষা শেষে জীবনে উন্নতির পথ ছিল। এই ভাবে অনেক সার্ফ এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আশ্রয় পেত। ব্যবসায়ীদের কাছেও অনেক সার্ফ আশ্রয় নিত।

বিদ্রোহ ঃ অন্যায়-অত্যাচারের চাপে সার্ফগণ বহু দিন ধরে মুক্তির পথ খুঁজছিল। মাঝে মাঝে তারা বিদ্রোহও করত। অনেক জমিদারীতে সার্ফগণ বিদ্রোহ করেছিল; কিন্তু তাদের দমন করা

হয়েছিল নির্মমভাবে। এর ফলে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারী এলাকার সব সার্ফই বিদ্রোহ ঘোষণা করত; এরা নিজেদের মধ্যে সংগঠনও গড়ে তুলেছিল। চাপে পড়ে অনেক জমিদার তাদের অনেক দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন কোন এলাকার সব সার্ফই নিজেদের স্বাধীনতা কিনে নিত; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সবাই পালিয়ে যেত জমিদারী ছেড়ে। এইভাবে সার্ফদের আর ধরে রাখা সম্ভব হল না। শেষে ধর্মযুদ্ধে অনেক সার্ফ যোগ দিয়ে তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রাণ দেওয়া সার্ফ জীবনের দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক ভাল বলে তাদের মনে হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। ফিউডাল প্রথা কি? এই প্রথার সূত্রপাত কখন হয়? ইউরোপের নানা স্থানে এই ফিউডাল প্রথা কি প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল?

২। ফিউডাল প্রথার বৈশিষ্ট্য এবং ফিউডাল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। কাদের 'কাউন্ট' বলা হত? কাউন্টদের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটি বিবরণ দাও।

৪। সামন্ত কি? সামন্ত প্রধানদের কি কি কাজ ছিল? সামন্ত প্রথায় গির্জার স্থান কি ছিল?

৫। কাদের 'নাইট' বলা হত? কোন্ যুগে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল? এদের কাজ কি ছিল?

৬। জমিদারী প্রথার বৈশিষ্ট্য কি? কি ভাবে এবং কখন এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল? আলোচনা কর।

৭। মধ্যযুগে ইউরোপে চাষীদের অবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালী কেমন ছিল?

৮। মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় কি কোনরূপ শ্রেণীভেদ ছিল? থাকলে তা কিরূপ?

৯। কাদের 'সার্ফ' বলা হত? এদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল? এরা কি ভাবে মুক্তির পথ খুঁজেছিল?

অষ্টম অধ্যায়	ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের আসল উদ্দেশ্য ক্রুসেডের যুদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ঃ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক যীশুখ্রীষ্ট বেথেলহেম নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই নগর প্যালেস্টাইন দেশের অন্তর্গত। এই দেশের জেরুসালেম নগরের কাছেই যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। জেরুসালেম ও প্যালেস্টাইনের অনেক স্থানে যীশুর জীবনের অনেক ঘটনা ঘটেছিল। তাই জেরুসালেম ও প্যালেস্টাইন খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান। বহুদিন প্যালেস্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্যালেস্টাইন দখল করে নিয়েছিল। খ্রীষ্টানগণের তীর্থদর্শনে মুসলমানগণ কোন বাধা দিতেন না, কারণ তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তাঁরা প্রচুর কর আদায় করতেন।

একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কী বা তাতার জাতি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এরা জেরুসালেম অধিকার করে। এই সময় থেকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর কিছু অন্যায়-অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল। এইসব অত্যাচারের কাহিনী যখন অতিরঞ্জিত হয়ে ইউরোপে এসে পৌছাতে লাগল, তখন তীর্থযাত্রা এক ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। রোমান ধর্মগুরু পোপ ও পিটার দি হারমিট এই তীর্থস্থানগুলি উদ্ধার করার জন্য ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষা করার জন্য ও খ্রীষ্টান তীর্থস্থানগুলি উদ্ধার করবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। এক বিরাট বাহিনী পবিত্র তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য যাত্রা শুরু করল। ক্রুশ খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র। এই প্রতীক চিহ্ন গ্রহণ করে যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়েছিল। তাই এই যুদ্ধকে ক্রুসেডের যুদ্ধ বা "ধর্মযুদ্ধ" বলা হয়।

তীর্থস্থানগুলির উদ্ধার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলেও, এর ভিতর আরও অনেক উদ্দেশ্য ছিল। আসল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথম হল সাম্রাজ্য বিস্তার। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ আশা করেছিলেন যে, ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ

করতে পারলে তাঁরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারবেন। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপিত হলে ধর্মপ্রচারের কাজেও তাঁদের সুবিধা হবে। এই দুটি দেশ জয় করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

পশ্চিম ইউরোপের ধর্মযাজকগণ তখন অনেক ধর্মীয় বিষয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন ছিলেন। তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইন সম্রাটকে সাহায্য করতে পারলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গির্জাগুলির উপর পোপের প্রভাব বেড়ে যাবে, প্রাচ্যের গির্জাগুলি পশ্চিম ইউরোপের আদেশ মেনে চলবে। রোমান পোপই খ্রীষ্টান জগতে সর্বেসর্বা হবেন—এটাই হল ক্রুসেডের যুদ্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

তুর্কীদের সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দেওয়া হল ক্রুসেডের তৃতীয় উদ্দেশ্য। তুর্কীদের সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ব দেশের সম্রাটদের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুর্কী আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে এই সময় বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় অ্যালেক্সিস রোমের পোপ দ্বিতীয় আর্বানের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। রোমের পোপ এটাকে তাঁর পক্ষে বিশেষ সুযোগ বলে মনে করলেন। তুর্কী আক্রমণের ভয় ক্রুসেডের যুদ্ধের তৃতীয় উদ্দেশ্য।

এই সময় পশ্চিম ইউরোপের ফিউডাল প্রধান রাজা ও সামন্তগণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে মত্ত ছিলেন। পোপ নানা ভাবে এই বিরোধ ও যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীষ্টান রাজগণের মধ্যে যুদ্ধ তিনি পছন্দ করেন নি। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। খ্রীষ্টান রাজাদের ধর্মযুদ্ধে লাগাতে পারলে তাঁদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার সুবিধা কমে যাবে, এটাই ছিল পোপের ধারণা। পশ্চিম ইউরোপের রাজাদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করা ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধের চতুর্থ কারণ।

এই সকল উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রোমের পোপ দ্বিতীয় আর্বান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লেরমণ্টে ইউরোপের সমস্ত নোবলদের এক সভা ডাকলেন। এই সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি সকল ইউরোপ-বাসীকে ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি উদ্ধার করার

আবেদন করলেন। পিটার দি হারমিট নামে এক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক দেশে দেশে গিয়ে এই আবেদন প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ : ক্লেরমন্টের সভায় ক্রুসেডের জন্য প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। তার এক বছর পর ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ বাহিনী পবিত্র তীর্থভূমির দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। পবিত্র তীর্থভূমি উদ্ধারের জন্য অনেক বীর এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এমন অনেক সৈন্য ছিল যারা কোন দিন যুদ্ধ করেনি। প্রথম দিকে পিটার দি হারমিট এই সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর সৈন্যদল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পর্যন্ত গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

প্রথম ধর্মযুদ্ধ : এর পর ধর্মযুদ্ধ বাহিনী পরিচালনার ভার নিলেন সিসিলির নরম্যান বীর বহেমণ্ড। এ ছাড়া ইউরোপের অনেক অভিজাত বংশের বীর ও রাজপুত্র এই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ইউরোপের কোন রাজা এই যুদ্ধে যোগদান করেন নি।

ধর্মযুদ্ধ বাহিনী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছিয়ে সম্রাট অ্যালেক্সিসের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তির শর্ত ছিল, ধর্মযুদ্ধে যে সব দেশ জয় করা হবে তাদের সম্রাট হবেন বাইজেন্টাইন সম্রাট। ক্রুসেড বাহিনী চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। তিনিও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মযুদ্ধ বাহিনী নিসিয়া দখল করে জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তারা ডেরিলিউম নগর দখল করে অ্যান্টিওক আক্রমণ করল। এখানে তুর্কীদের সাথে প্রবল যুদ্ধ বাধল। মুসলমানগণ ধর্মযুদ্ধ বাহিনীকে অবরোধ করে রাখলেন। অ্যালেক্সিস অন্য জায়গায় তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ধর্মযুদ্ধ বাহিনীকে তিনি কোন সাহায্য করতে পারলেন না। এই সময় দৈবক্রমে ধর্মযুদ্ধ বাহিনী একটা পবিত্র বর্শা পেয়ে গেলেন। এই বর্শা দ্বারাই নাকি যীশুখ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়েছিল। বর্শা পেয়ে তাদের মনোবল বেড়ে গেল। তাঁরা অ্যান্টিওক দখল করে জেরুসালেমের দিকে আগাতে লাগলেন। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেড বাহিনী জেরুসালেম দখল করে সেখানকার সমস্ত

মুসলমানদের হত্যা করলেন। বীর গডফ্রে এখানকার শাসনকর্তা বা রাজা হলেন।

জেরুসালেম অধিকৃত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপে আনন্দ ও উল্লাসের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এখানে আরও কয়েকটি গ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১১৪৪ গ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা অ্যাডেসা রাজ্য দখল করে নিলে দ্বিতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধ নিষ্ফল হয়েছিল।

তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ ঃ তুর্কীবীর সালাদিন ১১৮৭ গ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম দখল করেছিলেন। সেইজন্য আবার ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হয়। এই তৃতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধের নেতা ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড। প্রথম দিকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তাঁরা প্যালেস্টাইনের অনেক স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু জেরুসালেম যাওয়ার পথে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। জেরুসালেম জয় করার পর কে সেখানকার রাজা হবেন—এটাই ছিল ঝগড়ার বিষয়। রিচার্ডের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও অষ্ট্রিয়ার ডিউক দেশে ফিরে গেলেন। বাধ্য হয়ে রিচার্ড তুর্কীদের রাজা সালাদিনের সাথে এক চুক্তি করে দেশে ফিরলেন। এই চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল যে গ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না।

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ঃ জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য আবার আন্দোলন হতে লাগল। এর ফলেই চতুর্থ ক্রুসেডের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধ বাহিনী প্রথমে ভেনিসে এসে পৌঁছেছিল। ভেনিস সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য ছিল জারা। জারা ছিল গ্রীষ্টান রাজ্য। জারা রাজ্য আক্রমণের বিনিময়ে ভেনিস ধর্মযুদ্ধ বাহিনীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ক্রুসেড বাহিনীরও টাকার দরকার ছিল খুব বেশী। তারা পোপের নিষেধ না শুনে গ্রীষ্টান রাজ্য জারা দখল করে নিয়েছিল। ভেনিসবাসীর প্ররোচনায় ক্রুসেড বাহিনী এর পর কনস্টান্টিনোপলও

আক্রমণ করেছিল। সেখানের অধিবাসীদের হত্যা করে মূল্যবান ধন-সম্পত্তি লুঠ করা হয়েছিল, কনস্টান্টিনোপলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্লাণ্ডার্সের কাউন্টকে কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে বসান হয়েছিল ও গ্রীক ধর্মযাজকদের সরিয়ে রোমান ধর্মযাজক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তীর্থস্থান দখল অপেক্ষা ধনলোভ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভই এই চতুর্থ ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ছিল। তা ছাড়া ধর্মযুদ্ধ বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল ইতিহাসে এর নজির আর দ্বিতীয় নেই। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

সমাজ সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব: ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও এর ফলে মধ্যযুগের সমাজ ও সভ্যতার অনেক উন্নতি হয়েছিল। মধ্যযুগে এশিয়া ইউরোপ থেকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল। শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্পেও প্রাচ্যের খ্যাতি ছিল। কনস্টান্টিনোপল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় কেন্দ্র ছিল। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপের লোকে এই নূতন সভ্যতার সাথে পরিচয় লাভ করেছিলেন। ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে ইউরোপীয়গণ তাঁদের দেশে সাহিত্য ও শিল্প নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ইউরোপের অনেক উন্নতি হয়েছিল। প্রাচ্যের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সমাজেও অনেক পরিবর্তন এসেছিল। নূতন ধরনের ঘরবাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ ইউরোপীয় সমাজে স্থান পেয়েছিল। অনেক নূতন খাবার জিনিসও ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। ভাল কাপড়, মসলিন, কার্পেট প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজে ধনী লোকেরা ব্যবহার করতে শিখেছিলেন।

প্রাচ্যের সাথে সংযোগের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ইউরোপীয়রা অনেক উন্নতি করতে পেরেছিলেন। রোমান ও গ্রীক সাহিত্য দর্শন, নাটক প্রভৃতি তখনও প্রাচ্যেই টিকেছিল। ক্রুসেডের পর এগুলি আবার ইউরোপে এসেছিল। আরবগণ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যায় খুব উন্নতি করেছিলেন। ইউরোপবাসীগণ এদের সাথে

যোগাযোগের ফলে এই সব বিদ্যা শিখে নিয়েছিলেন। প্রাচ্য দেশের গল্প-কাহিনী ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই সময় নূতন ভাবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ হয়েছিল। ক্রুসেডের যুদ্ধের বীরত্ব-কাহিনী ইউরোপীয় দেশগুলির সাহিত্য ও কাহিনীতে স্থান পেয়েছিল। অ্যারিষ্টটলের বইগুলি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ইউরোপে চিকিৎসা বিদ্যারও প্রসার ঘটেছিল।

নূতন শহর ও ব্যবসা-কেন্দ্র ঃ প্রথম ধর্মযুদ্ধেই ইউরোপীয়গণ জেরুসালেম অধিকার করেছিলেন। তাঁদের অধিকার স্থায়ী করার জন্য তাঁরা ঐ অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইতালীর উপকূলের শহরগুলিতেই তাঁরা বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তীর্থযাত্রীদের যেন আর কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয় এটাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইতালীর উপকূলে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহর ক্রুসেডের আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। চতুর্থ ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় শহরগুলি ধর্মযুদ্ধ বাহিনীর কাছ থেকে অনেক অর্থ ও নানা রকম সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। আরও অনেক নূতন শহর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এগুলি হল ত্রিপলি, একর, সিডন, বেরুট প্রভৃতি। ক্রুসেডের পর ইউরোপবাসী বেশী দিন এই শহর ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলি হাতে রাখতে পারেন নি; কিন্তু এদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয় নি। ক্রুসেডের যুদ্ধের পরই ইউরোপে প্রাচ্যের জিনিসের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। এই জিনিসগুলি এই সব ব্যবসা-কেন্দ্র থেকে আনা হত।

কুটীর শিল্প ঃ ক্রুসেডের পর ইউরোপেও অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। কিছু দিনের মধ্যে ইউরোপের শহরগুলিতে নূতন নূতন জিনিস তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছিল। কাপড় বোনা, কার্পেট তৈরি করা, সোনা-রূপার গহনা তৈরি করা প্রভৃতি আরম্ভ হয়েছিল। ক্রুসেডের যুদ্ধে অনেক চাষী ও সার্ফ যোগ দিয়েছিল। তারা আর জমিদারীতে ফিরে যায়নি। চাষ আবাদের কাজ ছেড়ে তারা শহরে নূতন হাতের কাজ শিখতে আরম্ভ করেছিল। কিছু দিন কাজ শেখার পর তারা

নিজেরাই এই সব কাজ করার জন্য শহরেই বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল।

অনুশীলনী

১। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে? কখন এই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল? এর উদ্দেশ্য কি?

২। ক্রুসেডের যুদ্ধ প্রধানতঃ কয় ভাগে বিভক্ত? প্রতিটি বিভাগের বিবরণ দাও এবং ফলাফল আলোচনা কর।

৩। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল? কি কারণে এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করতে পারে নি?

৪। দেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ধর্মযুদ্ধের কি প্রভাব পড়েছিল? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) ধর্মযুদ্ধের পর কুটীর শিল্পের উন্নতি হল কেন?
(খ) ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে তাতার জাতির সম্পর্ক কি?
(গ) ক্রুসেডের যুদ্ধে প্রতীক চিহ্ন কি ছিল?
(ঘ) বীর গডফ্রে কে ছিলেন?
(ঙ) কোন্ স্থানে ধর্মযুদ্ধ বাহিনীর হত্যাকাণ্ড চরমে উঠেছিল?

৬। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক যীশু —— নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
(খ) ধর্মযুদ্ধের প্রথম দিকে —— সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।
(গ) দ্বিতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধ —— হয়েছিল।
(ঘ) জারা ছিল —— রাজ্য।
(ঙ) —— কে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

নবম অধ্যায়	মধ্যযুগের শহর শহরের উৎপত্তি শহরের জীবনযাত্রা ও পরিচালন ব্যবস্থা বুর্জোয়া

শহরের উৎপত্তি

সভ্য জগতে শহরের দান অপরিসীম। প্রাচীন যুগেও শহরের অভাব ছিল না; তবে মধ্যযুগে শহরের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যে অনেক বড় বড় শহর ছিল। গ্রীস দেশেও প্রাচীন কালে শহরের সংখ্যা কম ছিল না। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বহুদিন পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর রূপে বিখ্যাত ছিল। মুসলমান সাম্রাজ্যেও অনেক বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছিল। বাগদাদ, কর্ডোবা প্রভৃতি নগর সেকালের বিখ্যাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল।

শহরের উৎপত্তি ঃ মধ্যযুগে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই শহর গড়ে উঠেছিল। ফিউডাল যুগে ইউরোপে গ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল। ফিউডাল জায়গীদারগণ নিজ নিজ জমিদারীতে অনেক গ্রাম সৃষ্টি করেছিলেন। এই গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সব জিনিস দরকার সেগুলি সব গ্রামেই তৈরি হত। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বা জমিদারগণ কিছু বিলাসের উপকরণ বাইরের জগৎ থেকে আনিয়ে নিতেন।

ক্রুসেডের প্রভাব ঃ ধর্মযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। প্রাচ্য দেশের সাথে যোগাযোগের ফলে ইউরোপের লোকের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন আসে। প্রাচ্যের পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা রকমের খাবার জিনিস মসলা প্রভৃতির চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই সকল জিনিস প্রথম দিকে ইতালী, ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি শহর থেকে আনতে হত। কিছু দিন পরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দেশেই তৈরি করা আরম্ভ হয়েছিল।

জমিদার ও সামন্ত প্রধানগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যগুলি বিভিন্ন দেশ থেকে আনতেন। এই সব জিনিস ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের

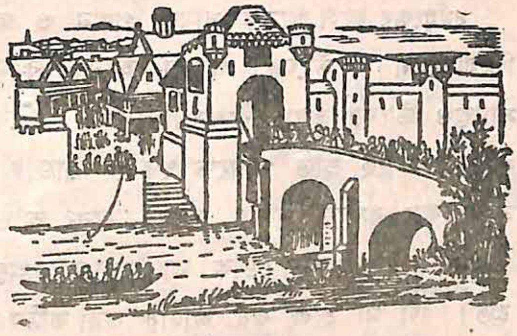
লোকেরা আনত। ক্যাসেল বা জমিদার বাড়ীর পাশেই এরা বাস করত। এদের বাসস্থানের জন্য কিছু জায়গা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। ক্রুসেডের পর ব্যবসায়ীর সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাগুলিও বাড়তে লাগল। কিন্তু এতেও ব্যবসায়ীদের স্থান দেওয়া সম্ভব হল না। নানা জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণ বাজারে বিক্রি করতে শুরু করল। ক্রুসেডের যুদ্ধে অনেক মজুর ও সার্ফ যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে এরা আর জমিদারীতে ফিরে গেল না। এরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ দিল, কোন কোন ব্যক্তি নূতন হাতের কাজ শিখে, নূতন জিনিস তৈরি করতে আরম্ভ করল; আর জিনিসগুলি সাধারণ বাজারেই বিক্রি করতে শুরু করেছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে অনেক নূতন বাড়ী, নূতন বাজার গড়ে উঠতে আরম্ভ হল। ক্যাসেল, বা জমিদারের বাড়ীর পাশের ব্যবসায়ীদের বাস করার জায়গাও বড় হল। অনেক নূতন বাজারও বসতে আরম্ভ হল। এমনি করে বড় বড় বাজারগুলি ও কেনা-বেচার স্থানগুলি শহরে পরিণত হল।

বণিক সমিতি ঃ বাজারগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্যও ব্যবসায়ীদের বাসস্থানগুলির উন্নতি বিধানের জন্য কতক ব্যবসায়ী উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাঁরা কয়েকজন ব্যবসায়ী নিয়ে একটা সমিতি গড়ে তুললেন। ক্রমে সমিতির সংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রত্যেক পণ্যের উৎপাদন ও আমদানীকারী ব্যবসায়ীগণ আলাদা সমিতি গড়ে তুললেন। তাঁতী, কামার, কুমোর, নাপিত, লেখক (নকলনবীশ) এমনকি আইনজীবীদের জন্যও পৃথক সমিতি হল। প্রত্যেক সমিতি থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে একটা বড় কেন্দ্রীয় সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। শহরের উন্নতি বিধান, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাগুলির সুব্যবস্থা করাই ছিল এদের কাজ। এঁরা শহরেই বাস করতেন।

ব্যবসা সমিতিগুলি নিজ নিজ ব্যবসায়ের প্রসারের দিকে নজর

দিতেন। শিল্প কাজ শেখার জন্য এঁরা কিছু শিক্ষানবীশ সংগ্রহ করতেন। শিক্ষানবীশগণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বা ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থাকতো, সেখানে খাবারও পেত; কিন্তু কোন দৈনিক মজুরী পেত না। কাজ শেখা শেষ হলে এরা মুক্তি পেত। স্বাধীন ভাবে নূতন জিনিস তৈরি করে তারা বাজারে বিক্রি করত। এদের "জার্নীম্যান" বা ভ্রমণকারী শিল্পী বলা হত। এইভাবে কিছু টাকা বা পুঁজি সংগ্রহ করে এরা নূতন ব্যবসা খুলতে পারত; আর তাদের পুরাতন প্রতিষ্ঠান— অর্থাৎ যেখানে তারা শিল্প কাজ শিখেছিল সেখানে থাকতেও পারত এবং পরে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা মালিকও হতে পারত। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি করা, গরীবদের সাহায্য করা, অসুস্থ ব্যবসায়ীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ব্যবসা সমিতির কাজ ছিল।

শহরের জীবনযাত্রা ঃ মধ্যযুগের শহরে বাস করা খুব সুখের ছিল না। শহরের মাঝে থাকত বিরাট বিরাট বাড়ী; এর মধ্যে কোন কোনটা দোতালায়, তিনতালাও হত। নীচের তালাতে সাধারণতঃ কেনা বেচা চলত। শিক্ষানবীশ-গণকে এইখানে নানা শিল্পকাজের শিক্ষা দেওয়া হত। শহরের



মধ্যযুগের শহর

মাঝে যে পথগুলি ছিল, সেগুলি খুবই সঙ্কীর্ণ। শহরে ব্যবসায়ী ছাড়া অনেক সাধারণ মানুষও বাস করত। এদের বাড়ীগুলি খুব বড় হত না। কোন বাড়ীতেই জানালা থাকত না। পথের দু'ধারে বাড়ী থাকার ফলে শহরে আলো-বাতাস যাওয়া-আসার অসুবিধা হত। জলনিকাশের জন্য কোন নর্দমা বা ড্রেনের ব্যবস্থা ছিল না; ময়লা ফেলার কোন নির্দিষ্ট জায়গাও ছিল না। শহরের পরিবেশ তাই খুবই অস্বাস্থ্যকর

ছিল। রোগ, ব্যাধি, মহামারি প্রায় লেগেই থাকত। শহরগুলির চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। শহরের ভিতরে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য কতকগুলি বড় বড় ফটক বা গেট থাকত। সন্ধ্যার পূর্বেই ফটকগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত। সন্ধ্যার পর আর কোন লোককে শহরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হত না। প্রত্যেক শহরে গির্জা ও বণিক সমিতির সভা করার জন্য হলঘর থাকত। এগুলি সাধারণত কোন খোলা জায়গায় তৈরি করা হত।

শহরের পরিচালন-ব্যবস্থা : সামন্তপ্রধান ও জমিদারীর এলাকাতেই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। শহরের উপর কর্তৃত্ব তাঁরাই দাবী করতেন। প্রথম দিকে শহর গড়ে তোলায় তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব ছিল না। বণিক-সমিতিগুলি গড়ে ওঠায় শহরের অনেক ব্যবসায়ী ধনী হয়ে উঠেছিলেন। এই সমিতিগুলির শক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল। এরাই তখন শহর পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে নিতে চেষ্টা করে।

ধর্মযুদ্ধের ফলে অনেক সামন্ত প্রধান ও জমিদারগণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। সৈন্য-সামন্তও তাঁদের হাতে বিশেষ ছিল না। এঁদের টাকার দরকার হলে ধনীদের কাছে হাত পাততে হত। রাজার টাকার দরকার হলে নূতন কর বসাতে হত। তখন শহরের অভিজাত ব্যক্তি, ধর্মযাজক ও ধনী ব্যক্তিদের সভা ডেকে কর বসানো, অনুমোদন করিয়ে নিতে হত। তা না হলে কর আদায় করা কঠিন হত। বণিক সমিতির এই নূতন ধনী সম্প্রদায় এই সুযোগে তাঁদের দাবী আদায় করে নিতেন। রাজাকে বাধ্য হয়ে এঁদের হাতে শহরের পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হত। রাজা লিখিত ভাবে সনন্দ বা প্রজার অধিকারগুলি লিখে দিতে বাধ্য হতেন। একে বলে চার্টার বা সনন্দ পত্র। এতে খুব বেশী সুবিধার কথা লেখা থাকত না। রাজা আর অন্যায় ভাবে বা জোরজুলুম করে কর আদায় করবেন না, ভাল ভাবে রাজ্য শাসন করবেন; শহর পরিচালনার ভার এখানকার অধিবাসী ও ব্যবসায়ী

সম্প্রদায়ের হাতেই থাকবে, এই কথাগুলি কাগজে লিখে নজির হিসাবে রাখা হত।



বুর্জোয়া

বুর্জোয়া (Bourgecis) কথার উৎপত্তি ঃ ফিউডাল ম্যানারের কাছেই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘেরা জায়গা বা ব্যবসায়ীদের বাসস্থানকে 'বার্জ' বলা হত। এখানে যারা বাস করত তাদের বলা হত 'বার্জার'। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া বার্জারদের দিয়ে আরও অনেক কাজ করানো হত। ডিউক, কাউন্ট, জমিদার ও সামন্তগণ নিজেদের প্রয়োজনেই বার্জ তৈরি করেছিলেন। বার্জ শব্দের অর্থ সুরক্ষিত স্থান। এই স্থানগুলিতে যারা বাস করত তাদেরই বুর্জোয়া বলা হত। ক্রুসেডের পর বার্জের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ছোট জায়গায় আর কাজ চলত না। শিল্পীর সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। খোলা বাজারে তারা তাদের তৈরী জিনিসগুলি বিক্রি করত। বার্জের বাইরে যে ব্যবসায়ীগণ থাকত তাদের বলা হত 'ফাউবার্জেস' অর্থাৎ বাইরের ব্যবসায়ী। ক্রমে এদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন এরাও দাবী করল যে তাদের বাজার বা শহর প্রাচীর দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করে দিতে হবে। এই স্থানগুলিও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। এর ফলে শহরের সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল, তেমন বৃদ্ধি হল নূতন ধনী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা। এই ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ক্রমেই প্রবল হতে লাগল। মধ্যযুগের ইউরোপে এই ধনী সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া হল বার্জেসেস্। বার্জ শব্দ থেকে বার্জেস ও বুর্জোয়া শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবে যে নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হল তাকেই বলা হয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা থার্ড এস্টেট। এই ভাবে বুর্জোয়া কথার উৎপত্তি হয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ীদের তখনকার দিনে বুর্জোয়া বলা হত।

এতদিনে ইউরোপের সমাজে ধনী আর গরীব, এই দুটি সম্প্রদায় ছিল। ধনী সামন্ত ও জমিদার, আর দরিদ্র ও নিঃস্ব চাষী আর সার্ফ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। ইউরোপের পরবর্তী কালের ইতিহাসে মধ্যবিত্তদের প্রভাব পড়েছিল খুব বেশী।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে শহরের উৎপত্তি কি ভাবে ঘটেছিল? এগুলির উপর ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কি প্রভাব ছিল?

২। মধ্যযুগে শহরের বিন্যাস কেমন ছিল? শহরের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবরণ দাও।

৩। মধ্যযুগে উদ্ভূত শহরের বণিক সমিতির বিষয়ে কি জান? এদের কি কাজ ছিল?

৪। মধ্যযুগে শহরের শাসন-ব্যবস্থা কেমন ছিল? উদাহরণ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। বুর্জোয়া কথাটির অর্থ কি? ইউরোপে কি ভাবে বুর্জোয়ার উদ্ভব হয়েছিল?

৬। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:

(ক) সভ্য সমাজে শহরের দান কিরূপ?

(খ) শহরের উৎপত্তি কখন হয়েছিল?

(গ) 'বার্জ' কাকে বলা হয়?

(ঘ) থার্ড এস্টেট বলতে কি বোঝ?

(ঙ) 'জার্নীম্যান' কাদের বলা হত?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) —— যুগে ইউরোপে গ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) বার্জের বাইরের ব্যবসায়ীদের —— বলা হত।

(গ) ব্যবসায়ীদের বাসস্থানকে —— বলা হত।

(ঘ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ——।

(ঙ) কর্ডোবা একটি প্রাচীন —— নাম।

দশম অধ্যায় (ক)	মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য ঃ চীন তাং রাজবংশ (৬১৮ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) সুং রাজবংশ (৯৬০ থেকে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ) য়ুয়ান রাজবংশ (১২৮০ থেকে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)

তাং সাম্রাজ্য (৬১৮—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)

হান রাজবংশের পতনের পর চীনদেশে নানা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মঙ্গোল, তাতার ও হূণ জাতির আক্রমণকারীগণ চীনের উত্তর দিকে হানা দিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। এই সব বিশৃঙ্খলা দূর করে সূই বংশের সম্রাটগণ (৫৮৯-৬১৮ খ্রীঃ) চীনদেশে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রায় ৪০ বৎসর ধরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ চীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তাং বংশের সম্রাটগণ চীনদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশের সম্রাটগণ কোরিয়া, তুরস্ক, তিব্বত ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাং বংশের দ্বিতীয় সম্রাট তাই-সুং দক্ষিণে আনাম রাজ্য জয় করে, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাং সাম্রাজ্যের মত এত বিশাল সাম্রাজ্য সে সময় আর দ্বিতীয় ছিল না।

আইন ঃ এই সময় দেশের প্রচলিত আইনগুলির সংস্কার করা হয়েছিল। আইনগুলি লিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। দেশে আইনের শাসন চালু করা হয়েছিল। চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থা খুব কঠিন ছিল; লেখার পদ্ধতিও ছিল খুব জটিল। চীনে শিক্ষিত ব্যক্তির খুব সমাদর ছিল। লেখাপড়া শিখতেও অনেক সময় লাগত। পরীক্ষা পদ্ধতিও খুব জটিল ছিল। রাজকাজে নিয়োগের সময় এই জটিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। তাং বংশের সম্রাটদের সময় পরীক্ষা-পদ্ধতি অনেক সরল করা হয়েছিল, লেখার পদ্ধতিও অনেক উন্নত করা হয়েছিল।

তাং যুগে চীনে কবিতা লেখার উন্নতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

লি-পো, তু-ফু, ওয়েই-ওয়াইং উ, ওয়াং-উই, পো-চুই প্রমুখ কবিগণ কবিতা লিখে চীনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাং বংশের রাজত্বকালেই চীনদেশে চা-পানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। বই ছাপার ব্যবস্থা, ছাপ দিয়ে টাকাপয়সা তৈরি করার প্রথাও প্রথম চালু হয়েছিল। চীনামাটি, পাথর ও পোড়া মাটির মূর্তি তৈরির কাজও খুব উন্নত হয়েছিল।

তাং যুগ চীন দেশের গৌরবের যুগ ঃ সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি এর আগে চীন দেশে এমন ভাবে কখনও হয়নি। তাই তাং যুগকে "চীনের গৌরবের যুগ" বলা হয়।

তাং সম্রাটগণ চীনের উত্তর ও দক্ষিণ এলাকাগুলিকে রাজ্যের মধ্যে আনার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। এইজন্য বিভিন্ন দিকে অনেক খাল কেটে ছিলেন। এর ফলে দেশের লোকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছিল। চীনের উদ্বৃত্ত ফসল, চা, রেশমের কাপড় প্রভৃতি জলপথে অন্যান্য দেশে পাঠান হত। এই সময় আরব দেশ, মিশর, পারস্য, বর্মিও ও ভারতের সাথে চীন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। চীনের উত্তর দিকে ইয়াংসি নদীর উপকূল ভাগ খুব উর্বর ছিল। খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষিকাজের উন্নতি সাধন করা হয়েছিল। লিশিমিন নামে এক সম্রাট কৃষকদের অবস্থার উন্নতিমুলক অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। চাষীদের উপর কর ভারও লাঘব করেছিলেন।

হান রাজাদের সময় চীন দেশে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তাং বংশের সময় বৌদ্ধ ধর্মের আরও প্রসার ঘটেছিল। চীন দেশের অনেক পর্যটক ভারতে এসেছিলেন ও চীন দেশে অনেক বৌদ্ধ মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ পুস্তকগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও খুব উন্নতি হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্যান্য অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচারকগণও এই সময় চীন দেশে এসেছিলেন। এই সময় চীন দেশে কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। জাপান, কোরিয়া, আনাম, কম্বোডিয়া ও শ্যামদেশে চীন সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

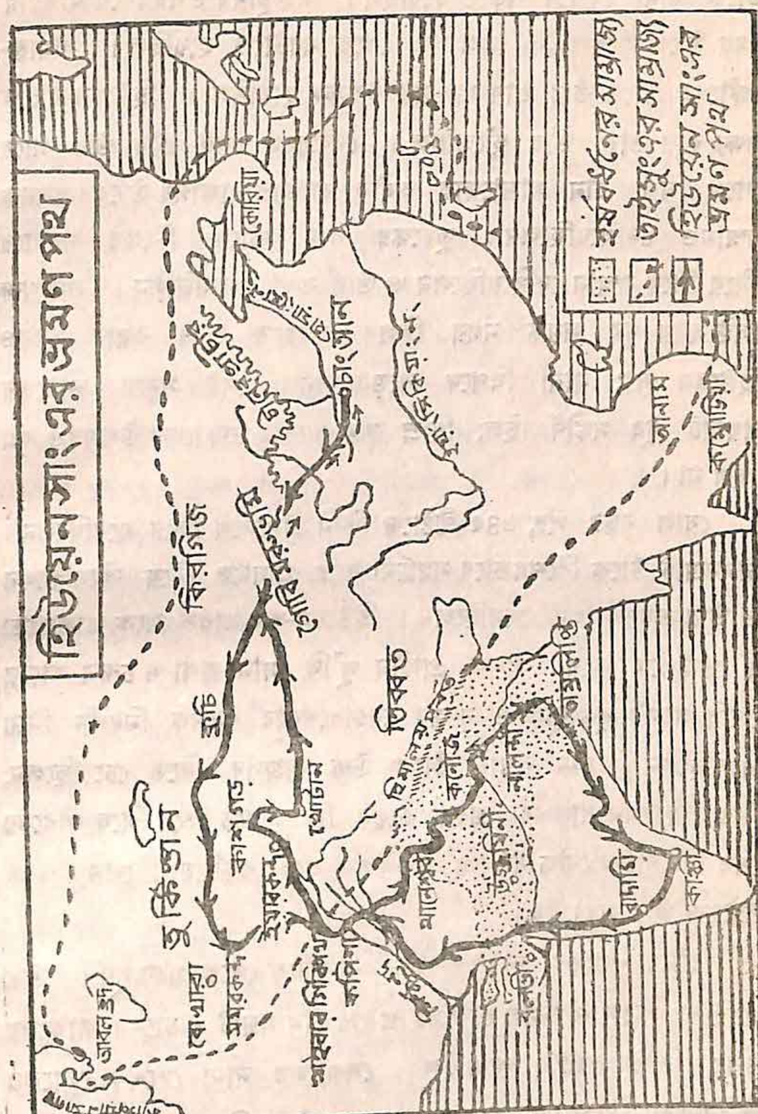
সেকালের জগতে তাং সাম্রাজ্য একটি আদর্শ সাম্রাজ্যরূপে পরিণত হয়েছিল। চীনের গৌরবের কথা পৃথিবীর সব সভ্য দেশে প্রচারিত হয়েছিল। বাইজেন্টাইন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সম্রাটগণ চীন সম্রাটের কাছে রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। তাং সাম্রাজ্যে চীনের স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হিউয়েন-সাং-এর ভারত পর্যটন ঃ হিউয়েন-সাং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর ভারতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ২৯ বছর বয়সে চীনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে তিনি ভারতের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন। গোবি মরুভূমি পার হয়ে তিনি তাসখন্দ ও সমরখন্দে আসেন ও সেখান থেকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত খাইবার গিরিপথ পার হয়ে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গান্ধার রাজ্যে আসেন। সেখান থেকে তিনি ভারতের নানা-স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতে তিনি চৌদ্দ বছর ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দিকের পথ দিয়ে ফিরেছিলেন। পামির মালভূমি পার হয়ে কাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান ও লপ-নর হয়ে চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের কাছে আগেকার পথে এসে পৌছে চীনদেশে প্রবেশ করেছিলেন।


হিউয়েন সাং

হিউয়েন-সাংএর যাত্রাপথ নানা রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পূর্ণ। পথে


হিউয়েনসাং-এর ভ্রমণ পথ
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
তাইৎসুং-এর সাম্রাজ্য
হিউয়েনসাং-এর ভ্রমণ পথ
কোরিয়া
চাংআন
কিরগিজ
তিব্বত
খোটান
কাশগড়
সমরকন্দ
বোখারা
হিমালয় পর্বত
কনৌজ
নালন্দা
তাম্রলিপ্ত
আসাম
কামরূপ
বাদামি
কাঞ্চী

তাঁকে নানা বিপদে পড়তে হয়েছিল। মরুভূমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে কয়েক দিন জল না খেয়ে কাটাতে হয়েছিল। সীমান্ত-রক্ষীদের হাতে তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হিউয়েন-সাংকে লক্ষ্য করে তারা তীর ছুঁড়েছিল। দৈবক্রমে সেই তীর তাঁর গায়ে লাগে নি। চীন সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যের রাজাগণ তাঁকে অনেক সম্মানও দেখিয়েছিলেন। তুরস্কের খান তাঁকে নিজের দরবারে নিয়ে গিয়ে সম্মান দেখিয়েছিলেন ও তাঁর কথা শুনেছিলেন। সমরখন্দ সেই সময় খুব সমৃদ্ধ নগর ছিল। ভারতে ভ্রমণ করার সময়ও হিউয়েন সাং নানা বিপদে পড়েছিলেন। সেই সময়ে ভারতের পথঘাট খুব সঙ্কীর্ণ ছিল, হিংস্র জন্তু ও চোর-ডাকাতের উপদ্রবও কম ছিল না।

ষোল বছর পর, ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে ফিরে এসেছিলেন। চীনসম্রাট তাঁকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন ও তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনেছিলেন। হিউয়েন-সাং ভারত থেকে তালপাতা ও ভূর্জপত্রে লেখা অনেক প্রাচীন পুঁথি, সোনা-রূপা ও চন্দন কাঠের তৈরি অনেক বুদ্ধ মূর্তি ও বুদ্ধের দেহাবশেষের অনেক নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। চীন সম্রাট তাঁকে উচ্চ রাজপদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিউয়েন-সাং তা গ্রহণ করেন নি। মঠে ফিরে গিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুশীলন করে কাটিয়ে ছিলেন। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিউয়েন-সাংএর ভারত পর্যটন নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পাণ্ডিত্য, সাহস ও নির্মল চরিত্রের প্রভাব চীন সম্রাট ও চীনের লোকদের উপর বিশেষ ভাবে পড়েছিল। সেকালের নানা দেশের লোকের জীবনযাত্রা শিক্ষা ও সভ্যতার কথাও তাঁর বিবরণে স্থান পেয়েছে। এই হিসাবে তাঁর বিবরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। এই ভ্রমণের ফলে চীনের সাথে ভারতের যোগাযোগ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সুং রাজবংশ (৯৬০—১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

তাং সাম্রাজ্যে চীনদেশে নানা উন্নতি হলেও মঙ্গোল ও তুর্কীদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়নি। উত্তরাঞ্চলে বার বার হানা দিয়ে তারা তাং সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাং সম্রাটগণ পূর্বের গৌরব হারাতে থাকেন। সমগ্র চীন সাম্রাজ্য ছোট ছোট পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে সুং রাজবংশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এঁরা পিকিং-এর দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলি জয় করে সর্বপ্রথম এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। সুং বংশের সম্রাটদের মধ্যে তাই সুং ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ও শেন-টুং ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এদের সময় চীনের দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলি সুং বংশের রাজাদের হাতে আসে এবং রাজ্যে অনেক উন্নতিমূলক ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকে চীনের সমাজ ব্যবস্থায় জমিদারশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগও এঁরাই বেশী পেতেন।

সমাজ ব্যবস্থাকে নূতন ভাবে রূপ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা সুং বংশের সম্রাটদের সময়ই প্রথমে আরম্ভ হয়। ওয়াং-আন শি নামে এক সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী এই ব্যবস্থার প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। চীনদেশের জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। তিনি ছিলেন খুব বিদ্বান। তা ছাড়া ইয়াংসি নদীর বন্যার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার কাজেও তিনি খুব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

তিনি জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার কেড়ে নিয়ে রাজ্যের সরকারের হাতে আনতে চেয়েছিলেন। কৃষকদের অসুবিধাগুলি দূর করার বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগী করতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাভাবে যেন কৃষিকাজের ক্ষতি না হয় সেজন্য সরকার থেকে চাষীদের ঋণদান করতে বলেছিলেন। এই ব্যবস্থায় শুধু জমিদারদের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। খাজনা

আদায়ের ভার তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জমিদার বংশের লোকই ছিল বেশী। তাঁরা এই ব্যবস্থা মানতে চাননি। তাই এই ব্যবস্থা সফল হয়নি। এই ব্যবস্থা সফল না হলেও প্রায় তিন শত বছর ধরে এই আন্দোলন চলেছিল। ওয়াং-আ-গুচি নামে এক সম্রাটও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। ইনি একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনের সম্রাট ছিলেন। জিনিসপত্রের দর বেঁধে দেওয়া, মজুরী স্থির করে দেওয়া, সরকারী তহবিল থেকে চাষীদের ঋণ দেওয়া প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা করে তিনি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করেছিলেন। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এই সময় জনসাধারণের উন্নতিমূলক এমন ব্যবস্থার কথা জানা যায় না।

সুং সাম্রাজ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি ঃ সুং সম্রাটদের সময় চীনদেশে শিক্ষা ও সভ্যতার অনেক উন্নতি হয়েছিল। ওয়াই-সুং নামে এক সম্রাট শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেই কবিতা লিখতে ও সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। এই সময় চীনে চীনামাটির বাসন ও মূর্তি তৈরির কাজেরও খুব উন্নতি হয়েছিল; সুং সম্রাটদের সময় জাপানের সাথে যোগাযোগও খুব বেড়ে গিয়েছিল; সেখানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। এই সময় চীনের সমাজকে যেমন নূতন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনি ধর্মের ব্যাপারেও কনফুসিয়াসের প্রাচীন উপদেশগুলি নূতন করে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সময়ে ইউ-ফেই নামে এক বীরের জন্ম হয়েছিল। তিনি মঙ্গোল ও তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে চীন দেশ থেকে তাদের তাড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে চীন দেশে অনেক লোকসাহিত্য ও লোকগাথা রচিত হয়েছিল।

সুং যুগে চীন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। নিদারল্যাণ্ড, আরব দেশ ও ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। আরব দেশ ও ভারতবর্ষের সাথে যোগাযোগের ফলে

চীনদেশে গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই সময় চীনে নৌবিদ্যারও খুব উন্নতি হয়েছিল।

সুং সম্রাটগণ ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় চীন সাম্রাজ্যের খুব উন্নতি হলেও সমগ্র চীনদেশে তাঁরা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। চীনের উত্তর দিকে মঙ্গোল ও তুর্কীদের আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য বার বার তাদের রাজধানী সরিয়ে দক্ষিণ দিকে আনতে হয়েছিল। সুং যুগের শেষের দিকে রাজধানী হাং চাউ নগরে সরান হয়। কিছু দিন পরেই মঙ্গোল-বীর চেঙ্গিস খানের আক্রমণে (১২০৬ খ্রীঃ) এদের সাম্রাজ্য প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। মঙ্গোলদের সাথে মিত্রতা করে তাঁরা অনেকদিন তাঁদের ছোট রাজ্য টিকিয়ে রেখেছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান এদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেন।

চেঙ্গিস খানের চীন আক্রমণঃ চেঙ্গিস খান মঙ্গোল জাতির লোক ছিলেন। মঙ্গোলদের আদি বাসস্থান ছিল সাইবেরিয়ায়। হূণ ও তাতার উভয় দলই মঙ্গোল জাতির লোক। এরা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। এদের মধ্যে ভাল যোদ্ধার অভাব ছিল না। তাং বংশের রাজত্বকাল থেকেই তারা চীনের উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ ও লুটপাট করতে থাকে। সুং সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে এদের অত্যাচার আরও বেড়ে গিয়েছিল।

১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিস খানের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল তেমুজিন। তাঁর পিতা মঙ্গোলদের এক দলের নেতা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিও সেই মঙ্গোলদের নেতা হন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি খুব শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদল নিয়ে তিনি অনেক দেশ জয় করে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন ও সেখানকার রাজা হন। 'চেঙ্গিস' কথার অর্থ সর্বশক্তিমান, আর 'খান' কথার অর্থ রাজা। তেমুজিন এখন 'চেঙ্গিস খান' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান রাজা উপাধি গ্রহণ করে রাজ্যবিস্তার শুরু করে দিলেন।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিত ভাবে চীনের রাজধানী পিকিং আক্রমণ করেন। চীনবাসী কোন প্রস্তুতির সুযোগ পায় নি। বাধ্য হয়ে তারা রাজধানীর প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেয়। পিকিং নগর চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কয়েক দিন এই ভাবে থাকার পর এক বিশ্বাস ঘাতক চীনবাসীর সাহায্যে চেঙ্গিস খান পিকিং-এ ঢোকার গোপন পথ জেনে নেন। পিকিং-এ ঢুকে চেঙ্গিস খান লুটপাট শুরু করে দেন। মঙ্গোলদের হাতে অনেক চীনবাসী নিহত হল। চীনরাজও পিকিং থেকে বিতাড়িত হন। ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর চীনের সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁর অধীনে আসে। তাঁর এক বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে চীনদেশের অন্যান্য অংশ জয় করার ভার দিয়ে চেঙ্গিস খান অন্যান্য দেশ জয়ে বেরিয়ে পড়েন।

পারস্য, আফগানিস্থান ও ভারতের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে চেঙ্গিস বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বোখারা, সমরখন্দ প্রভৃতি নগর ধ্বংস করে তিনি মুসলমান সভ্যতার অনেক ক্ষতি সাধন করেছিলেন। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া সমগ্র এশিয়া চেঙ্গিসের পদানত হয়। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশের সান সি প্রদেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

অত্যাচারী হলেও চেঙ্গিস খানের চরিত্রে অনেক গুণ ছিল। বীরত্বের দিক থেকে তিনি আলেকজাণ্ডার ও জুলিয়াস সিজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর উদার মনোভাব ছিল। তাঁর রাজধানী কারাকোরামে বিদ্বান ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ সমাদর পেয়েছিলেন। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। কিছুদিন পরে তাঁর পৌত্র কুবলাই খান চীন সাম্রাজ্য দখল করেন।

কুবলাই খান : চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কুবলাই খান ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে পিকিংএর সিংহাসনে বসেন। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি সমগ্র সুং সাম্রাজ্য জয় করে চীনে মঙ্গোল উয়ান রাজবংশ

প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

কুবলাই খান তাঁর সাম্রাজ্য আরও বাড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি দুইবার জাপান জয় করবার জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিযান বিফল হয়েছিল। তাঁর জাভা অভিযানও ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ ও কম্বোডিয়া এই দুটি রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন।

কুবলাই খানের সময় চীন সাম্রাজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা করেছিলেন। জলপথ ও স্থলপথে ইউরোপের সাথে চীন দেশের যোগাযোগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কুবলাই খানের সময় চীনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। চীনা ভাষায় লেখা অনেক পুস্তক মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর সময় চীনদেশে অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। রাজপরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অনেক চীনা পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন। চীনের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁর রাজসভায় সমাদর পেতেন।



কুবলাই খান

চীনা সভ্যতা কুবলাই খানের মঙ্গোলীয় স্বভাবের অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিল। তিনি খাঁটি সম্রাট হতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবও তাঁর উপর কম পড়েনি। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর অনেক পদে তিনি চীন দেশের লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ-কর্মচারীদের সকলকেই চীনা ভাষা শিখতে হত। জনসাধারণের সুবিধার জন্য তিনি চীনের বিখ্যাত খালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে-ছিলেন। রাজধানী অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় সজ্জিত করা হয়েছিল। তিনি অনেক বৌদ্ধ মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন।

এই সময় তিব্বতের সাথে চীনের যোগাযোগ খুব বেড়ে গিয়েছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল ও অনেক বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও প্রাচীন সংস্কারের ফলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের রূপ পালটে গিয়েছিল। তিব্বতের রাজাকে দালাইলামা বা প্রধান লামা বলা হয়। তিব্বতবাসীরা তাঁকে বুদ্ধের অবতার বলে মনে করেন। বৌদ্ধধর্মে এমন কোন অবতারের কথা নাই। তিব্বতের বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়ায় ও অন্যান্য উঁচু জায়গায় ধর্মচক্র বসান হয়েছিল। সেই চক্রে বৌদ্ধ মন্ত্র (ওঁ মণিপদ্মেহূম্) লেখা থাকত। এই চক্র বাতাসে ঘোরে। তিব্বতবাসী বৌদ্ধদের ধারণা যতবার চক্র ও মন্ত্র ঘুরবে ততবার প্রার্থনা করা হবে। তিব্বতের অনেক স্থানে রেশমের কাপড়ের পতাকায়ও এই মন্ত্র লেখা পতাকা এখনও দেখা যায়।

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পরে চীনে জাতীয় ভাবধারা বিকাশ হয় ও মিংরাজ বংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রীঃ) চীন সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ঃ মার্কো পোলো ভেনিসের ব্যবসায়ী বংশের সন্তান ছিলেন। পিতা নিকোলো পোলো ও পিতৃব্য মাফ্‌ফো পোলোর সাথে ছোটবেলায় তিনি একবার প্রাচ্য দেশে গিয়েছিলেন। বড় হয়ে তাঁর দেশভ্রমণের ইচ্ছা বেড়ে যায়। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাবা ও কাকার সাথে তিনি প্রাচ্যে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বারের বিদেশ যাত্রার সময় তাঁরা প্রথমে প্যালেস্টাইন হয়ে জেরুসালেমে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সাইলেশিয়া, আর্মেনিয়া ও মেসোপোটেমিয়া (ইরাক) পার হয়ে তাঁরা ওরমুজে আসেন। তারপর পারস্যের উপর দিয়ে বাল্ক, পামির, কাসগড় পার হয়ে ইয়ারখন্দে আসেন। গোবি মরুভূমি পার হয়ে হিন্দুকুশ পর্বতের পথে সাচাও হয়ে তাঁরা পিকিং-এ পৌঁছেছিলেন। চীন সম্রাট কুবলাই খাঁ সসম্মানে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে এসেছিলেন।

মার্কো পোলো খুব বুদ্ধিমান ছিলেন ; তুর্কী ভাষাও তিনি ভাল করেই জানতেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কুবলাই খানের প্রিয়পাত্র

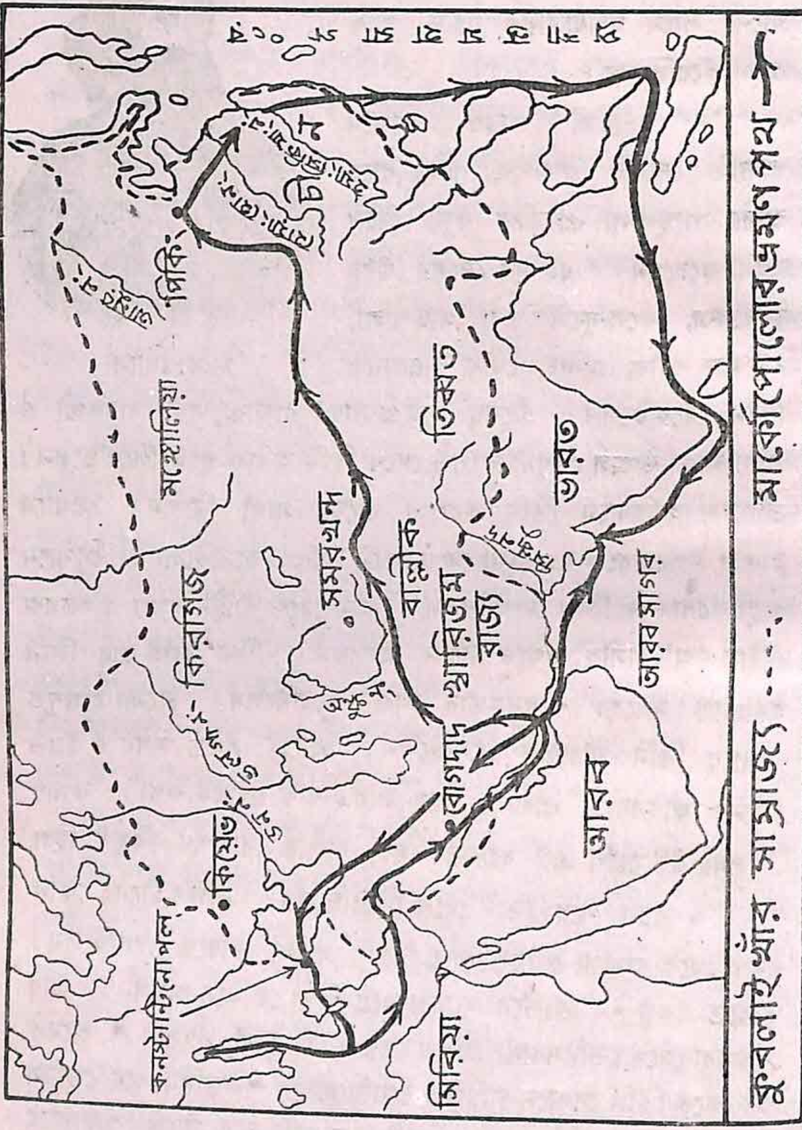
হয়ে ওঠেন ও চীন সম্রাটের কাজে নিযুক্ত হন। রাজকার্যে তাঁকে অনেক দেশে যেতে হয়েছিল। কুবলাই খানের সাথে যুদ্ধযাত্রায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।



মার্কো পোলো

চীন, ভারত, পারস্য, জাপান প্রভৃতি দেশের রাজপথ, পথের ধারে সুন্দর পান্থশালা প্রভৃতির কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। এই সব দেশের উর্বর কৃষিক্ষেত্র, ফলে-ফুলে ভরা গাছপালা, বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও তিনি দেখেছিলেন। চীনের রাজপ্রাসাদ, বাজার, ধনী ব্যবসায়ী ও নানা রঙের উজ্জ্বল রেশমী কাপড় দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশ অভিযানে তিনি কুবলাই খানের সাথী ছিলেন। সেখানে হাতীর উপর থেকে যুদ্ধ করা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। জাপানে প্রচুর সোনাও তিনি দেখেছিলেন। চীন দেশে খ্রীষ্টান রাজ্য ও অনেক খ্রীষ্টান অধিবাসীর কথাও তিনি বলেছেন। তিন বছর ধরে তিনি ইয়াংচাউ নগরের শাসনকর্তার কাজ করেছিলেন। চীনের রাজদূত হিসাবে তিনি ভারতেও এসেছিলেন। প্রাচ্যে সমৃদ্ধ নগর ও উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে তাঁর অবাক হবারই কথা। কারণ সে সময় ইউরোপে এই ধরনের নগর, বাজার, রাজপথ কিছুই ছিল না। ৭ বছর পরে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। দক্ষিণ চীনের কোন বন্দর থেকে সুমাত্রা ও মালয় হয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। ভারতে কিছুদিন কাটিয়ে পারস্য হয়ে তিনি ভেনিসে আসেন। তাঁর বেশভূষা দেখে ভেনিসবাসী প্রথমে তাকে চিনতেই পারেনি। অনেক চেষ্টা করে তিনি সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ভেনিস ও জেনোয়ার সাথে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে বন্দী হয়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। জেলখানার আর এক কয়েদীর সাহায্যে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এই কাহিনীই মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করে মানুষের মনে সমুদ্রপথে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে যাবার পথ আবিষ্কার করার চেষ্টাও বৃদ্ধি পায়।



পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের উপরও এই কাহিনীর প্রভাব পড়েছিল। এই কাহিনী অবলম্বন করে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের সুদূর প্রাচ্য ঃ জাপান

দশম অধ্যায় (খ)	মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের সামাজিক অবস্থা মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা রাজার উপর শক্তিশালী বংশ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব জাপানে সোগান যুগ জাপানীদের বীরত্ব

মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের সামাজিক অবস্থা ঃ মধ্যযুগে জাপানের সমাজ কতকগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হত। এই দলগুলির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। জাপানে অবশ্য একজন রাজা ছিলেন ; তিনি এই দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দলের নেতা ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত জাপানে কোন শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠেনি।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। চীন দেশের সাথে জাপানের যোগাযোগও বেড়ে যায়। জাপানীরাও চীনদের মত শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে ও রাজার ক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা শুরু করেছিল।

এই উদ্দেশ্যে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে টাইকওয়া সংস্কার নামে নূতন শাসনসংস্কার প্রচলিত হয়। জাপানে এই সময় জাপানী সমাজে শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। শাসকশ্রেণীর সরকারী কর্মচারিগণ বিনা খাজনায় অনেক জমি ভোগ দখল করতেন ; তাঁরা কোন বেতন পেতেন না। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরেও অনেক জমি দান করা হয়েছিল। এই জমিগুলিও করমুক্ত ছিল। বাকী জমিগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। দেশের বেশীর ভাগ জমির উপর কর না থাকায় কৃষকদের উপর করের বোঝা ছিল খুব বেশী। জমি চাষ করে যে ফসল হত, কর দিতেই তার বেশীর ভাগ খরচ হয়ে যেত, জমি চাষ করে চাষীদের কোন লাভ হত না।

ফিউডাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ জাপানের চাষীরা তাই তাদের জমিগুলি বড় বড় জমিদারদের দিয়ে দিত ; আর শুধু চাষ করার

জন্য তাদের কাছ থেকে সেগুলি আবার ফিরিয়ে নিত। এভাবে জমির মালিকানা জমিদারদের হাতে চলে গেল। জমিদারগণ জমি পেয়ে সেগুলির খাজনা দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। জাপানের লোকসংখ্যা এই সময় অনেক বেড়ে গিয়েছিল, অনেক নূতন জমিও তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলিও শাসক সম্প্রদায় নানা কাজের পুরস্কারস্বরূপ রাজার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। এই সময় দেশে দুই শ্রেণীর মানুষ ছিল—ধনবান জমিদার সম্প্রদায় আর গরীব চাষী সম্প্রদায়। এই ব্যবস্থা ইউরোপের মধ্যযুগে ফিউডাল প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়।

জমিদারী রক্ষা করা ও পাশের জমিদারের জমিগুলি জোর করে কেড়ে নেবার জন্য শক্তিশালী সৈনিক দলেরও সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়। তা ছাড়া রাজা যাতে জোর করে জমিদারী কেড়ে নিতে না পারেন সেজন্যও সৈন্যের দরকার ছিল। সৈন্যদলের প্রধানরাও ক্রমে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন ও দূরের প্রদেশগুলি দখল করে নিয়েছিলেন। শুধু রাজধানী ছাড়া দেশের আর কোথাও রাজার কর্তৃত্ব ছিল না বললেই হয়।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা: মিকাডোর প্রাধান্য: জাপানের সম্রাটকে "মিকাডো" বলা হয়। জাপানের আদি সম্রাট জিম্মুতেন্না সূর্যের বংশধর ছিলেন বলে জাপানীদের ধারণা। রাজাকে জাপানীরা দেবতার মত ভক্তি করত। রাজা জাপানীদের প্রাচীন শিন্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিতও ছিলেন। সে হিসাবেও তাঁর প্রাধান্য আরও বেড়ে গিয়েছিল।

চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এই সময় থেকে চীনদেশের সাথে জাপানীদের যোগাযোগ বেড়ে যায়। জাপানের অনেক শিক্ষার্থী চীনদেশে লেখা-পড়া শিখতে যেতেন। সে সময় চীনে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। চীনের সম্রাটের ক্ষমতা ও সম্মান খুব বেশী ছিল। জাপানীরাও নিজের দেশকে চীনের মত শক্তিশালা করতে চেষ্টা করেছিলেন। চীন সম্রাটের মত জাপান সম্রাটও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চেয়ে-

ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নূতন সংস্কার প্রচার করা হয়েছিল। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নারা নামক স্থানে চীনের নূতন রাজধানী নির্মাণ করা হয়েছিল ও রাজধানীতে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল। চীনের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই জাপানীরা নকল করতে আরম্ভ করেছিল; চীনা প্রথায় লেখাও এই সময় জাপানে আরম্ভ হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে চীন দেশের মত জাপানেও পরীক্ষা নেওয়া হত। চীনা প্রভাবের সাথে জাপানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও পড়েছিল। জাপানের সম্রাটগণ দেশের নানা স্থানে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। চীনের প্রথায় দেশের রাজ্য শাসনব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বেশী; রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ধর্মীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হত। রাজবংশের পরিবর্তনও অন্যায় বলে মনে করা হত। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের জন্য বিচার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছিল। দেশের যে কোন লোক রাজার কাছে আবেদন করতে পারতেন। চীনের প্রথায় জাপানের সমাজেও পাঁচটি পরিবার নিয়ে ছোট দল ও পঞ্চাশটি পরিবার নিয়ে বড় দল গঠন করা হয়েছিল। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব এই দলগুলির উপর দেওয়া হয়য়ছিল। অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জাপানের রাজার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

শক্তিশালী পরিবারগুলির বাধাদানঃ জাপানে রাজার হাত থেকে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কেড়ে নেবার চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে ফুজিয়ারা বংশের লোকেরা বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শক্তিশালী জাপানী সম্রাটদের উপর তাঁরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। রাজার দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে ক্রমে তাঁরা রাজ্যের শাসনক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। রাজপরিবারের সাথে ফুজিয়ারাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাপানের রাজপুত্রগণ এই পরিবারে বিয়ে করতেন। তাই রাজাদের উপর তাদের প্রভাব খুব বেশী ছিল।

রাজপরিষদের সভ্য ও জাপানের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তার পদ তাঁরাই পেয়েছিলেন। নাবালক রাজাদের অভিভাবকের কাজও তাঁরাই করতেন। বড় হয়ে রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব চাইলে, রাজাদের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী করে বৌদ্ধমঠে পাঠিয়ে দেওয়া হত। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের রাজ্যশাসন এই বংশের হাতেই ছিল। তাঁরা অবশ্য রাজাকে তাঁর পদ থেকে সরাবার চেষ্টা করেননি।

রাজার উপর শক্তিশালী বংশ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ঃ প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে শিণ্টো ধর্ম প্রচলিত ছিল। 'শিণ্টো' কথার অর্থ ভগবানের পথ। প্রকৃতির নানা শক্তি ও পূর্বপুরুষদের পূজা এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। ধর্মমন্দিরগুলিও খুব সাধারণ ছিল। জাপানের রাজাই শিণ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিত হিসেবে গণ্য ছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে ওয়ানী নামে এক পণ্ডিত জাপানে কনফুসিয়াসের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। জাপানের রাজার শক্তির উপর এই ধর্মের কোন প্রভাব পড়ে নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ও চীনের সাথে জাপানের যোগাযোগ বাড়তে আরম্ভ করে। এর ফলে কিছু দিন পরে জাপান সম্রাটের ক্ষমতাও খুব বেড়ে গিয়েছিল। নবম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন রাজবংশের লোকেরা রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ফুজিয়ারা বংশের লোকেরা জাপানের শাসনব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করেছিলেন। তারপর মিনোমোতো বংশের লোকেরা রাজ্য শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপানে সোগানদের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়। রাজার কর্তৃত্ব শুধু দেওয়ানী রাজকার্যে পর্যবসিত হয়। রাজ্য রক্ষার ভার সোগান বা প্রধান সেনাপতির হাতে চলে যায়।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার আরম্ভ হয়। রাজ্যে অনেক বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছিল। মন্দির ও মঠ নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। রাজারাই এই অর্থ দান করতেন। তা ছাড়া মঠ ও মন্দির পরিচালনার জন্য অনেক জমিও দান করা

হয়েছিল। এই সব জমি থেকেও কর বা খাজনা আদায় করা হত না। এর ফলে রাজার আয় অনেক কমে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসী-দেরও রাজার উপর প্রভাব কম ছিল না। ফুজিয়ারা বংশের শাসনের সময় বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেড়ে গিয়েছিল। অনেক বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। রাজাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়ে মঠে ধর্ম চিন্তার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে রাজার শক্তি একেবারে কমে গিয়েছিল। সোগান যুগে রাজার পদকে ধর্মীয় প্রধানে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। রাজ্যের শাসন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালনে তাঁদের কোন ভূমিকাই ছিল না।

জাপানে সোগান যুগ

একাদশ শতাব্দীর শেষে জাপানের শাসনক্ষমতা দখল করার জন্য তাইরা ও মিনোমোতো বংশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাইরা বংশের লোকদের পরাজিত করে মিনোমোতো বংশের নেতা জোরিতোমো জাপানের শাসনক্ষমতা দখল করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট তাঁকে 'সোগান' বা প্রধান সেনাপতি উপাধি দান করেন। জোরিতোমো কামাকুরায় রাজধানী স্থাপন করেন ও সেখানে জাপানের বাকাফু বা সামরিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেন। প্রতি প্রদেশে সামরিক শাসনকর্তা ও সামরিক কর-আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও টোকিও'র দেওয়ানী শাসনকর্তাদের কাজে বাধা না দিয়ে তিনি কৌশলে জাপানে যে দ্বৈত শাসন পদ্ধতি চালু করেছিলেন, তা প্রায় ছয়শত বৎসরেরও বেশী স্থায়ী হয়েছিল।

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জোরিতোমোর মৃত্যু হয় ও জাপানের শাসন ক্ষমতা হোজো বংশের লোকেরা দখল করে নিয়েছিলেন। প্রায় দু'শ বছর ধরে ক্ষমতাহীন সম্রাট ও সোগানদের উপর হোজো বংশের প্রভাব ছিল। এই সময় জাপানের রাজধানীতে অনেক ভাল ভাল বাড়ী তৈরি করা হয়েছিল। কাঠের কাজ, তলোয়ার তৈরির কাজ ও চীনা-

মাটির বাসন তৈরির কাজও খুব উন্নত হয়েছিল। জাপানে অনেক নূতন বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছিল ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের 'জেন' সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বলা হত। এই সময়ে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে চীনের মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খান জাপান আক্রমণ করেছিলেন। জাপানীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। সমুদ্রের ঝড়েও কুবলাই খানের অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস হয়।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আশিকাগা বংশের লোকেরা শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন ও দু'শ বছর ধরে জাপানের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এই সময় জাপানে সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা প্রভৃতির খুব উন্নতি হয়েছিল ; কিন্তু রাজ্য শাসনব্যবস্থায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। একশত বছর ধরে জাপানে গৃহযুদ্ধ চলেছিল। নেবুনাগা ও ইজেজাস্যু নামে দুজন শক্তিশালী দাইমিও আর হিদেজোশী নামে কৃষক পরিবারের এক নেতার চেষ্টায় জাপানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল।

ইজেজাস্যু তাকোগাওয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে জাপানের সোগান বলে ঘোষণা করেন। তিনি বর্তমান টোকিওর কাছে জেদো নগরে রাজধানী স্থাপন করে জাপানে সামরিক ফিউডাল প্রথায় রাজ্যশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। যে বিশ্বস্ত দাইমিওগণ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বড় বড় জমিদারী দিয়ে নিজেকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। দাইমিওগণ যাতে খুব বেশী ক্ষমতাশালী হতে না পারে সেজন্য তিনি রাজধানীর কাছে তাদের থাকার ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। বছরের মধ্যে ছয় মাস তাঁদের এখানে বাস করতে হত। প্রায় আড়াই শত বছর ধরে জাপানে এই বংশের সোগানদের হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা ছিল।

জাপানের মিকাডোর পদকে আরও পবিত্র ও সম্মানিত করা হয়েছিল। তিনি শুধু ধর্মীয় চিন্তায় রত থাকতেন। রাজ্যের মন্ত্রী

ও অভিজাত বংশের লোক ছাড়া আর কারও সাথে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হত না।

সামুরাই ঃ শক্তিশালী দাইমিওদের সাহায্যে তাকোগাওয়া বংশের সোগানগণ রাজ্যের প্রধান হয়েছিলেন। দাইমিওদের ক্ষমতা সামুরাইদের শক্তির উপরই নির্ভর করত। দশম ও একাদশ শতাব্দীতেই সামুরাইগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। মিনোমোতো বংশের নেতা সামুরাই বংশের লোক ছিলেন। এই সময় থেকে সামুরাইদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। বিনা প্রতিবাদে দলপতির আদেশ মেনে চলা এদের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। আচার-ব্যবহার, অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে এঁরা বিশেষ নিয়ম মেনে চলতেন।

জাপানীদের বীরত্ব

জাপানীরা যোদ্ধার জাতি। প্রাচীন কালে যোদ্ধা দলপতিগণ জাপানে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করেছিলেন। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের যোদ্ধাদের কোন পৃথক দল ছিল না। অন্যান্য রাজকর্মচারীর মত সৈন্যবিভাগের কর্মচারীদের কোন কর দিতে হত না। নবম শতাব্দী থেকে জাপানীদের মধ্যে পৃথক যোদ্ধাদলের সৃষ্টি হয়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এদের অনেক প্রভাব বেড়ে ওঠে। ফুজিয়ারা বংশের লোকেরা এদের সাহায্যেই জাপানের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাইরা ও মিনোমোতা বংশের নেতারা যোদ্ধা-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তোকোগাওয়া সোগানগণ বুসি বা সামুরাইদের সাহায্যে জাপানের শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন।

বুসিডো ঃ সামুরাইদের বুসি বলা হয়। জাপানের দাইমিও বা জমিদারগণের শক্তি সামুরাইদের উপর নির্ভর করত। সামুরাইদের জীবন-যাপনের জন্য কতকগুলি নিয়ম ছিল। একে বুসিডো বা সামুরাইদের পথ বলা হত। সামুরাইদের বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ করার পদ্ধতি, নৈতিক চরিত্র, নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, দেশভক্তি প্রভৃতি এই নীতির ভিতর অন্যতম। সামুরাইদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীরও

নিয়ম ছিল। তাদের প্রতিদিন সকালে তীরধনু ও তলোয়ার চালনা, ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করতে হত। অবসর সময়ে পশু-পাখী শিকার ও মল্লযুদ্ধ করতে হত। বেশভূষা ও খাদ্য ছিল খুব সাধারণ। লেখাপড়া বিশেষ করে যুদ্ধবিদ্যার বই পড়ায় উৎসাহ দেওয়া হত। এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন না করলে যোদ্ধার কাজ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। যুদ্ধের সময় তারা বর্ম বা যুদ্ধের পোশাক পরত। যুদ্ধের অস্ত্র ছিল তরবারি। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে সামুরাইগণ অস্ত্রশিক্ষা করতেন। শিক্ষা শেষে দেশে দেশে ঘুরে তাঁরা অন্য যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করতেন। হেরে গেলে তাঁর কাছে আবার শিক্ষা নিতেন। সামুরাইগণ সাধারণতঃ দুটি তরবারি ব্যবহার করতেন, একটি ছোট আর একটি বড়। বড়টি দিয়ে তাঁরা যুদ্ধ করতেন, আর ছোটটি দিয়ে পরাজিত শত্রুর মাথা কেটে ফেলতেন। নিজেরা হেরে গেলে আত্মহত্যা বা হারিকিরি করতেন। তরবারি চালানোর কৌশল ছাড়া তারা জুজুৎসুও শিখতেন।

মিতব্যয়িতা, দেশভক্তি, নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সামুরাইগণের অবশ্য কর্তব্য ছিল। চরিত্র বল, সাহস ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাদের প্রধান গুণ ছিল। তাদের আত্মসম্মানবোধ এত বেশী ছিল যে পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করতেন।

অনুশীলনী

১। তাং সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝ? এই সাম্রাজ্য কখন এবং কি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তাং রাজবংশের শাসনব্যবস্থা ও আইন সংস্কার বিষয়ে যা জান লেখ।

২। "তাং সাম্রাজ্য চীন দেশের গৌরবের যুগ"—এই কথার তাৎপর্য কি?

৩। তাং যুগে চীন দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং শিল্পচর্চার কিরূপ উন্নতি হয়েছিল? এই সময় বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৪। হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন? তিনি কখন ভারতে এসেছিলেন? তাঁর ভারত পর্যটন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। হিউয়েনসাঙ কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন? তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা কর। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত পর্যটনের প্রভাব কিরূপ হয়েছিল?

৬। চীন দেশে সুং রাজবংশের প্রভাব কিরূপ হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। সুং রাজবংশ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এই রাজবংশের বিভিন্ন নূতন ও উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতি বিষয়ে যা জান লেখ।

৮। সুং সাম্রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৯। চেঙ্গিস খান সম্পর্কে কি জান? তিনি কখন চীনদেশ আক্রমণ করেছিলেন? এই আক্রমণের ফল কিরূপ হয়েছিল?

১০। চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১১। কুবলাই খান কে ছিলেন? তাঁর সময় চীনদেশের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?

১২। কুবলাই খান চীনে কোন্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা? তিনি চীন দেশে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন?

১৩। মার্কো পোলো কে ছিলেন? তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

১৪। মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৫। মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানের রাজনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা কর।

১৬। জাপানের সোগান যুগের বিষয়ে যা জান লেখ।

১৭। জাপানীদের বীরত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) মিকাডো কাকে বলে?

(খ) য়ুয়ান রাজবংশ কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(গ) চেঙ্গিস খানের চরিত্র কেমন ছিল?

(ঘ) য়ুয়ান বংশের পতনের কারণ কি?

(ঙ) মধ্যযুগের জাপানে জমি বণ্টন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

(চ) শিণ্টো ধর্ম কি ? কোন্ সময়ে এর উদ্ভব হয়েছিল ?

(ছ) ইজেজাস্থ্ কে ছিলেন ? তিনি কোন্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ?

১৯। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হিউয়েন সাং প্রসিদ্ধ —— ভিক্ষু ছিলেন।

(খ) —— সাম্রাজ্যে চীন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল।

(গ) বাল্যকালে চেঙ্গিস খানের নাম ছিল ——।

(ঘ) 'চেঙ্গিস' কথার অর্থ ——।

(ঙ) মার্কো পোলো —— ব্যবসায়ী বংশের সন্তান ছিল।

(চ) একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের রাজ্য শাসন—বংশের হাতেই ছিল।

(ছ) পঞ্চম শতাব্দীতে —— নামে এক পণ্ডিত জাপানে কনফুসিয়াসের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন।

(জ) —— যুগে জাপানে রাজার পদকে ধর্মীয় প্রধানে পরিণত করা হয়েছিল।

একাদশ অধ্যায়	**মধ্যযুগের ভারতবর্ষ** **গুপ্ত যুগের পর ভারত** (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী) **ভারতে হূণ আক্রমণ** **হর্ষবর্দ্ধন**

হূণ জাতির লেকেরা মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এরা দুটি দলে ভাগ হয়ে, এক দল ইউরোপে তাদের অভিযান আরম্ভ করেছিল। অপর দলটি ভারতের দিকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। পারস্য, কাবুল, গান্ধার প্রভৃতি দেশ জয় করে এরা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। হূণ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে এরা ভারতের রাজ্য শাসন করত। ভারতের হূণদিগকে "শ্বেত হূণ" বা এপথালাইট বলা হয়। এরা ছিল বর্বর ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বভাবের লোক।

ভারতে হূণ আক্রমণ ঃ উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ পার হয়ে গুপ্ত সম্রাট স্কন্ধগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ) হূণ জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেছিল। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে হূণদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্কন্দগুপ্তই হূণদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। এই সুযোগে হূণ-বীর তোরমান (৫১০ খৃঃ) আবার ভারত আক্রমণ করেন। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও গান্ধার জয় করে তিনি মালব পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির হূণ নেতার হাতে ভারতের বহু লোক নিহত হয়েছিল ও বহু মঠ, মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। তোরমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল ভারতের হূণ রাজ্যের রাজা হন। তিনিও পিতার মতই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন এবং ভারতের বহু বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। অবশেষে মান্দাসোরের রাজা যশোবর্মন মিহিরকুলকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করেন। মিহিরকুল তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

কিছুদিন পরে মিহিরকুল আবার মগধ আক্রমণ করেন। মগধের

রাজা বালাদিত্য মিহিরকুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এরপর হূণরা আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে পারে নি।

হূণ আক্রমণের প্রভাব: বার বার পরাজিত হয়ে হূণরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হূণদের সাথে আরও অনেক জাতির লোক ভারতে এসেছিল। এরা সবাই ভারতে বাস করতে আরম্ভ করেছিল। কিছু দিনের মধ্যে ভারতের লোকদের সাথে এদের বিবাহও আরম্ভ হয়ে যায় ও হূণরা ভারতবাসীর সাথে মিশে যায়। এই মিলনের ফলে ভারতে রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। হূণ আক্রমণের ফলে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়েছিল। গুপ্ত সভ্যতা ও শাসন পদ্ধতিরও অনেক ক্ষতি হয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত ভারতে আর কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি।

হর্ষবর্দ্ধন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের অবস্থা: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে—মগধে গুপ্ত বংশ, কনৌজে মৌখরী বংশ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ ও গুজরাটে মৈত্রক বংশের রাজারাই প্রধান ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে কনৌজের মৌখরী বংশের রাজা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। কনৌজ রাজ্য যুক্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল। থানেশ্বর রাজ্য ছিল পূর্ব পাঞ্জাবে। থানেশ্বরের রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্দ্ধন। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার সাথে থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়েছিল ও উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। এই সময় মালবের রাজা দেবগুপ্ত ও গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মিলিত হয়ে কনৌজ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মা নিহত হন ও তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। ভগিনীকে উদ্ধারের জন্য থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মাত্র ষোল বছর বয়সে হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬ খৃঃ) থানেশ্বরের রাজা হন। রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার: ৬১২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন কনৌজের সিংহাসনে বসে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। কামরূপের রাজা ভাস্কর-বর্মার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। শশাঙ্কের জীবিত অবস্থায় হর্ষবর্দ্ধন গৌড় রাজ্য জয় করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জাম জয় করেছিলেন। গুজরাট, কামরূপ ও সিন্ধু দেশের রাজাগণও তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন।


হর্ষবর্দ্ধন

হর্ষবর্দ্ধন বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানই তিনি জয় করেছিলেন। সেইজন্য তাঁকে 'উত্তরাপথনাথ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্য জয় করতে না পারলেও বেশীর ভাগ রাজ্যই তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী ও পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে।

হর্ষবর্দ্ধন সুশাসক ছিলেন। রাজধানী কনৌজ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত ছিল। রাজ্যের সর্বত্র তিনি নিজে গিয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন ও অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি বিধান ছিল। কৃষকগণ উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর দিতেন।

হর্ষবর্দ্ধন প্রথম জীবনে হিন্দু ধর্মের সমর্থক ছিলেন, পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রাজ্যের নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হলেও ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা কম ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধন শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও সুলেখক ছিলেন। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী গ্রন্থ লেখক বানভট্ট তাঁর সভায় স্থান পেয়েছিলেন। "নাগানন্দ", "রত্নাবলী" ও "প্রিয়দর্শিকা" নামে তিনটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের দানশীলতা উল্লেখযোগ্য। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি প্রয়াগে একটি মেলা বসাতেন। সেখানে প্রচুর ধনরত্ন তিনি প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানে তিনি এক ধর্মসভার আয়োজন করেছিলেন। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত পর্যটন ঃ হিউয়েন সাঙ চীনদেশের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে এসেছিলেন ও প্রায় চৌদ্দ বছর (৬৩০-৪৪) ভারতে কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে, তাঁর ভারত-পর্যটন সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থান, দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করাই তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতের কাশ্মীর, প্রয়াগ, কনৌজ, নালন্দা, কামরূপ, বাতাপি ইত্যাদি আরও অনেক বৌদ্ধ তীর্থস্থানে তিনি গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যেও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষাও তিনি শিখেছিলেন।

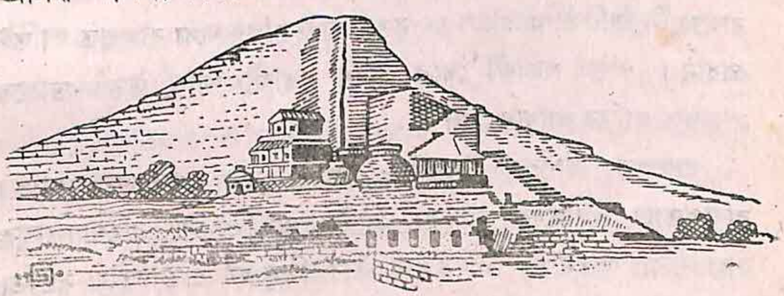
হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে সে সময়কার ভারতের শাসনব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়।

হিউয়েন সাঙের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। হিন্দু ধর্ম ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও বৌদ্ধ ধর্মের

প্রসার অনেক কমে গিয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। হিন্দু-ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাণসী। সেখানে অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ছিল। তক্ষশীলা, মথুরা, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশের শাসন-ব্যবস্থা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মত উন্নত ছিল না। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। দেশে কৃষকদের অবস্থা ভালই ছিল। ভারতে অনেক সমৃদ্ধ নগর ও শহর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত খুবই উন্নত ছিল। বাংলাদেশের তমলুক (তাম্রলিপ্ত) প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। গুজরাট, মালব প্রভৃতি স্থান থেকেও সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ভারতবাসী সরল ও সৎভাবে জীবন যাপন করত।

হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্দ্ধনের শাসন-ব্যবস্থা ও দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীরও তিনি খুব প্রশংসা করেছেন। নালন্দা, তক্ষশীলা ও দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিনগর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বহু প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ মূর্তি সংগ্রহ করে তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ সেকালের ভারতের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

নালন্দা : বিহারের অন্তর্গত পাটনা জেলার বড়গাঁও নামক স্থানে প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকালে এখানে



নালন্দা

একটি বৌদ্ধ মঠ ছিল। ভারতের বদান্য রাজাদের দানে এখানে খুব বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ছাত্রদের লেখাপড়া শেখা,

খাওয়া ও থাকার জন্য কোন বেতন দিতে হত না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে ছাত্র আসত। চীন, তিব্বত, কোরিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকেও বহু ছাত্র এসে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করত। এখানকার শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রায় এক হাজার শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-বলের জন্য দেশের সর্বত্র তাঁদের সম্মান ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্র এখানকার প্রধান পাঠ্য বিষয় হলেও, অন্যান্য নানা বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্ম, চিকিৎসা-বিদ্যা, সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞান এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও তর্কের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হত। হিউয়েন সাঙ এখানে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব প্রশংসা করেছেন। সেই সময়ে এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন মহাজ্ঞানী শীলভদ্র। তিনি বাঙালী ছিলেন। তাঁর মত জ্ঞানী পণ্ডিত সে সময়ে আর ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ

(অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

রাজপূত জাতির উৎপত্তি ঃ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অনেক নূতন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জাতির লোকেরা এই রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিল। নূতন জাতিগুলির মধ্যে রাজপুত জাতিই প্রধান। সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে রাজপুত জাতির প্রাধান্য ছিল।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। রাজপুতগণ নিজেদের ভারতের প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশের লোক বলে দাবী করেন। বহুদিন ধরে তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্য এদের ভারতীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। কোন কোন প্রাচীন শিলালিপিতে রাজপুতদের প্রতিহার বংশের গুর্জর নামক হূণ জাতির বংশধর বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ভারতবাসীর সাথে হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতির মিলনের ফলেই রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়েছে। সপ্তম শতাব্দী থেকেই রাজপুত বংশের বিভিন্ন শাখার লোকেরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

রাজপুতানার ছোট ছোট রাজপুত রাজ্যঃ রাজপুত জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে চারটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিহার বা পরিহার রাজপুত বংশের রাজাগণ দক্ষিণ রাজস্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরমার বংশের রাজপুতগণ মালবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ভোজ বিদ্বান ছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চৌহান বংশের রাজপুতগণ দিল্লী ও আজমীরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা গৌরবের সাথে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজ। চালুক্য বা সোলাঙ্কী বংশের রাজপুতগণ গুজরাটে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা প্রথম ভীম, জয়সিংহ, কুমারপাল প্রভৃতি রাজাগণ অনেক দিন ধরে এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়া খজুরাহের চন্দেলা বংশীয় রাজপুতগণ এলাহাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তোমর বংশের রাজপুতগণ দিল্লী ও থানেশ্বর অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। দিল্লী বা দিল্লীকা নগর তাঁরাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন।

পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুট বংশের প্রতিযোগিতাঃ বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে অরাজক অবস্থা চলছিল। দেশের এই দুর্দিনে বাংলার বিভিন্ন স্থানের নেতাগণ গোপাল নামে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। (আঃ ৭৫০ খৃঃ)। গোপালই বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খৃঃ) পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ'

উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করে উত্তর ভারতে তিনি প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রতিহার বংশের রাজাগণ রাজপুতানা ও মধ্যভারতে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজ কনৌজ অধিকার করেছিলেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। আরবদের পরাজিত করে তিনি তাঁর শক্তি আরও বাড়িয়েছিলেন।

রাষ্ট্রকূট রাজ্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল। দান্তিদূর্গ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রকুট-রাজ প্রথম কৃষ্ণ (৭১৬ খৃঃ) চালুক্যদের পরাজিত করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮০ খৃঃ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

কনৌজের সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতা ঃ পাল ও প্রতিহার বংশের রাজাদের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতা আগেই আরম্ভ হয়েছিল। রাষ্ট্রকুট রাজাগণ তাঁদের রাজ্য শুধু দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কনৌজের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন; এর ফলে কনৌজের সিংহাসন লাভের জন্য পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুটদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল।

কনৌজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যশোবর্মন (৭২৫ খৃঃ) এখানকার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। কবি ভবভূতি ও বাকপতি তাঁর রাজসভায় ছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার রাজা ধর্মপাল কনৌজ জয় করেছিলেন; কিন্তু প্রতিহার-রাজ বৎসরাজ তাঁকে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকুট-রাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করে কনৌজ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেন। এর ফলে ধর্মপাল আবার কনৌজ দখল করেন, চক্রায়ুধ নামে তাঁর এক আশ্রিত ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ আক্রমণ করে চক্রায়ূধকে বিতাড়িত করেন। তিনি ধর্মপালকেও পরাজিত করেছিলেন। কিছুদিন পরে রাষ্ট্রকূটগণ কনৌজ অধিকার করেছিলেন।

প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ভোজ ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কনৌজ জয় করেন ; কিন্তু বাংলার রাজা ধর্মপালের পুত্র দেবপাল তাঁকে পরাজিত করেন। প্রতিহার রাজ মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খৃঃ) আবার কনৌজ দখল করেন ; মগধ ও বাংলা দেশের কতক অংশও তিনি জয় করেছিলেন। ৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকুটগণ আবার কনৌজ দখল করেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কীগণ কনৌজ জয় করেন। দাক্ষিণাত্যেও রাষ্ট্রকুট প্রাধান্য কমে যায়। এখানে চালুক্যগণ প্রধান হয়ে ওঠেন।

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনে অক্ষমতা ঃ এই সময় বাংলার পাল রাজারা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোল বাংলার রাজাকে পরাজিত করেন। মহীপালের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে পাল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে সেন রাজাগণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের ফলে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুটদের শুধু শক্তি ক্ষয়ই হয়েছিল। কেউ ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

এই দুর্বলতার সুযোগে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতে নেপাল, কামরূপ, উৎকল, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও গাঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজাগণ নিজ নিজ রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির চেষ্টা করতেন।

(গ) বাংলা দেশ

রাজা শশাঙ্ক (আঃ ৬০৬-৬৩৭ খৃষ্টাব্দ) ঃ বাংলা দেশে সবচেয়ে আগে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা শশাঙ্ক। এই রাজ্য গৌড় রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। আনুমানিক ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

রাজা হওয়ার পর তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা) জয়

করেন। উৎকল (উড়িষ্যা), কঙ্গোদ রাজ্য ও মগধ জয় করে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়িয়েছিলেন। রাজ্য বিস্তার করার সময়ই মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সাথে মিত্রতা করে তিনি গ্রহবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মার মৃত্যু হয় ও তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যশ্রী থানেশ্বরের পুষ্যভুতি বংশের রাজা রাজ্যবর্দ্ধনের ভগিনী ছিলেন। ভগিনীপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু তিনি শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন বিরাট সৈন্যসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেছিলেন; কিন্তু শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। শশাঙ্ক জীবিত থাকতে হর্ষবর্ধন বাংলাদেশ জয় করতে পারেন নি। গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল প্রভৃতি শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চীনদেশের বিখ্যাত পর্যটক হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। সে সময়ে গৌড় রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কম ছিল না। আনুমানিক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসাবে শশাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাল ও সেন যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীঃ পাল ও সেন যুগে বাঙালীর জীবনযাত্রা সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কৃষিকাজই ছিল বেশীর ভাগ লোকের জীবিকা। কৃষকের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। ধান, আখ, তুলা প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল। ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সব্জি দুধ, ঘি, দুধের তৈরি নানা মিষ্টান্ন দ্রব্য, নানারকম ফল ও মূল বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল। বাঙালী পুরুষেরা ধুতি ও মেয়েরা শাড়ী পরত। পুরুষেরা চাদর গায়ে দিত; মেয়েদের মধ্যে ওড়না ব্যবহারের প্রথা ছিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরত।

মেয়েরা পায়ে আলতা ও কপালে কাজলের টিপ ও খোঁপায় ফুল দিত। প্রসাধনের জন্য চন্দনের গুঁড়া ব্যবহার করা হত। পুরুষেরা পায়ে কাঠের পাদুকা ও মাথায় ছাতা ব্যবহার করত।

সামাজিক জীবনঃ পাল ও সেন যুগে বাঙালীর সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। এই সময় বাংলাদেশে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা সুখের ছিল; কিন্তু সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল বলা যায় না। পাল যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জাতিভেদ প্রথা অনেক কমে গিয়েছিল; কিন্তু সেন যুগে আবার হিন্দু ধর্মের প্রসার হয়েছিল ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বেড়ে গিয়েছিল। সেন রাজাদের সময়েই বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। বল্লাল সেন বাংলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বিদ্যা, আচার-ব্যবহার, বিনয়, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি নানা গুণবান ব্যক্তিগণকে কুলীন বলা হত। সমাজে তাদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে। এই ভাবেই কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমান কালের মত প্রাচীন বাংলায় অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, প্রভৃতি নানা উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। সে সময় নানা দেব-দেবীর পূজা ও ব্রত পার্বণের প্রচলন ছিল! শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, সরস্বতী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে উৎসব-অনুষ্ঠান করা হত।

পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। (সমাজে নারী জাতির সম্মান ছিল না। মেয়েদের কোন সামাজিক অধিকার ছিল না। বিধবাদের সহমরণ প্রথা অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হলে তার সাথে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।) 5

ধর্মঃ বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা ধর্মপাল অনেক বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল। বাংলার ইতিহাসে এই

সময়কে বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার ঘোষ বাঙালী ছিলেন। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যবদ্বীপে (জাভা) মঞ্জুশ্রীর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তিব্বতে এই সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। সেন রাজাদের সময় বাংলা দেশে আবার হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। সেন রাজাগণ প্রথম দিকে শিবের উপাসক ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন। বাংলায় এই সময় যাগ-যজ্ঞ, বেদ-পাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠানও আরম্ভ হয়েছিল। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনেক পুস্তকও এই সময় রচিত হয়েছিল। দেশের সাধারণ লোক বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সব মতই পোষণ করতেন।

শিক্ষাঃ পাল ও সেন রাজাগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের শিক্ষানুরাগও প্রবল ছিল। এই সময় বাংলা ভাষারও উন্নতি হয়েছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের 'চর্যাপদ' বা সাধনভজনের গান এই সময়েই রচিত হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। সেন রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য ও উমাপতি ধর নামে পাঁচজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। জয়দেব তাঁর বিখ্যাত কাব্য "গীতগোবিন্দ" লিখে অমর হয়ে আছেন। ধোয়ী "পবনদূত" নামে একটি কাব্য রচনা করেছেন।

পাল যুগে বৌদ্ধ বিহার ও মঠগুলি বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছিল। পাল যুগের চন্দ্রকীর্তি, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বাঙালী ছিলেন। দেশের নানা স্থানে বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ বিহারে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করত। মঠ ও বিহারগুলির মধ্যে বিক্রমশীলাও বিখ্যাত ছিল।

বিক্রমশীলাঃ পাল-রাজ ধর্মপাল বর্তমান ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশীলা বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এই বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ছয়টি মহাবিদ্যালয় যুক্ত ছিল; বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়া ব্যাকরণ,

জ্যোতিষ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি এখানকার পাঠ্য বিষয় ছিল। বহু বিত্যার্থী এখানে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করত। অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিপাদ প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষাদান করতেন। বুদ্ধ জ্ঞানপাদ নামে এক মহাপণ্ডিত এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মপাল আরও অনেক বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মধ্যে সোমপুরী মহাবিহার বিখ্যাত।

ওদন্তপুরী ঃ নালন্দা বিশ্ববিত্যালয়ের কাছে ওদন্তপুরী বিহার অবস্থিত ছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রই এখানকার প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল। তা ছাড়া সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় এখানে পড়ান হত। মহালিঙ্গাচার্য শীলরক্ষিত এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। চন্দ্রগর্ভ নামে এক ব্যক্তি শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষা লাভ করে বিখ্যাত পণ্ডিত হয়েছিলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে চন্দ্রগর্ভের বাড়ী ছিল। ইনিই পরে শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

দক্ষিণ ভারত

বাদামীর চালুক্য ও কাঞ্চির পল্লব রাজবংশ ঃ উত্তর ভারতের মতই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর, দক্ষিণ ভারতে ছোট ছোট অনেক রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে চালুক্য ও পল্লব রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই তুই রাজ্যের রাজাগণ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে উভয়েই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন।

বাদামীর চালুক্য রাজবংশ ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের বর্তমান বিজাপুর জেলার কাছে রাজা প্রথম পুলকেশী (৫৪০ খৃঃ) চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বাদামী বা বাতাপি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। পুলকেশীর মৃত্যুর পর কীর্তিবর্মন কানাড়া ও কোঙ্কন প্রদেশের উত্তরাংশ জয় করে এই রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন। রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খৃঃ) এই রাজ্যের

শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। ক্ষমতাশালী সামন্তদের দমন করে তিনি তাঁর রাজ্যে শাসন ও শৃঙ্খলার উন্নতি বিধান করেছিলেন। উত্তরে কাবেরী নদীর তীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উত্তর ভারতে সেই সময়কার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্দ্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্যের প্রশংসা করেছেন। কাঞ্চির পল্লব রাজাদের সাথে বহু দিন ধরে তাঁর বিরোধ চলছিল। কাঞ্চিরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নৃসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চি আক্রমণ করে নৃসিংহবর্মনকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চি অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করে ও আরবদের গুজরাট থেকে বিতাড়িত করে তিনি চালুক্য রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

পল্লব রাজবংশ ঃ দক্ষিণ ভারতে পল্লব-রাজগণ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্চিনগর। অনেকে মনে করে, পল্লবগণ উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা সিংহবিষ্ণু কৃষ্ণা থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত ভূ-ভাগ দখল করে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খৃঃ) পল্লব রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলেন। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করেছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নৃসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। নৃসিংহবর্মন নৌবাহিনী গঠন করে দুইবার সিংহল অভিযান করেছিলেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্যের অনেক সুখ্যাতি করেছিলেন। চালুক্যদের সাথে ক্রমাগত বিবাদের ফলে এই রাজ্যও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া

দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, রাষ্ট্রকূটদের সাথেও তাঁদের বিরোধ চলেছিল। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চিনগর অধিকার করে নিয়েছিলেন। পল্লবরাজ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পের খুব উন্নতি হয়েছিল।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় চালুক্য ও পল্লবদের অবদান: দক্ষিণ ভারতকে 'মন্দিরময়' দেশ বলা হয়। প্রাচীন কালেই দক্ষিণ ভারতে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। চালুক্য ও পল্লব রাজাগণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও তাঁদের রাজ্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। চালুক্য-রাজগণ হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের রাজ্যে অনেক দেব-দেবীর মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীন চালুক্য মন্দিরগুলি উত্তর ভারতের গুপ্ত সম্রাটদের মন্দিরের মতই ছিল। পরে দক্ষিণ ভারতে নতুন ভাবে মন্দির তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এই রীতিতে উত্তর ভারতের মন্দিরের প্রভাবও ছিল। নতুন ভাবে মন্দির তৈরিকে দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড়ী রীতি বলা হয়। চালুক্য রাজাদের সময় বাদামীর কাছে পাহাড় কেটে অনেকগুলি বিষ্ণু মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। অজন্তার গুহায় এই সময় অনেকগুলি নতুন ছবি আঁকা হয়েছিল। চালুক্য রাজাদের নির্মিত মেগুটির শিব মন্দিরও শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আইহোলের বিষ্ণু মন্দির ও বাদামীর মন্দিরগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।


অজন্তার গুহা চিত্র

পল্লব রাজাদের সময় দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ

উন্নতি হয়েছিল। দ্রাবিড়ী রীতিতে প্রথমে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন পল্লব-রাজ মহেন্দ্রবর্মন। দ্রাবিড়ী রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। মহেন্দ্রবর্মনই মহাবলীপুরমে পাথর কেটে রথের আকারের মন্দির তৈরির রীতি বা প্রথার প্রচলন করেছিলেন। মহাবলীপুরমের রথাকৃতি



মহাবলীপুরমের মন্দির

সাতটি মন্দির পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। প্রত্যেকটি মন্দিরই এক এক খণ্ড পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে; মন্দিরের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও নক্সা কেটে সুন্দর ভাবে সাজান হয়েছে। এই সময় কাঞ্চিনগরেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কাঞ্চিনগরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল। অন্যান্য ধর্মের অনেক মন্দিরও সেখানে ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কাঞ্চিনগরে ৫০টি বৌদ্ধবিহার ও ৩০টি জৈন মন্দির দেখেছিলেন। কাঞ্চির কৈলাসনাথ শিবমন্দির পল্লব রাজাদের সময়ই নির্মিত হয়েছিল। পাহাড় কেটে নানা জীবজন্তুর মূর্তি তৈরি করার পদ্ধতিও পল্লব শিল্পের পরিচয় বহন করে। ভারতের বাহিরে যবদ্বীপ (জাভা), কম্বোডিয়া ও আনামে দ্রাবিড়ী রীতির প্রভাব পড়েছিল।

চোল রাজবংশের নৌ-শক্তির বিকাশ ঃ দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর,

ত্রিচিনাপলি ও আরও কিছু স্থান নিয়ে চোল রাজ্য গঠিত হয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে এই রাজ্যের নাম দেখা যায়। পল্লব রাজ্যের পতনের পর চোল রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পল্লব-রাজ অপরাজিত বর্মনকে যুদ্ধে হারিয়ে চোল-রাজ প্রথম আদিত্য চোল রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। তাঞ্জোর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ৯০৭ খৃষ্টাব্দে চোল-রাজ পরান্তক দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনীও ছিল। এই নৌবাহিনী নিয়ে তিনি সিংহল আক্রমণ করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণ চোল-রাজ পরান্তককে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য চোল-রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

চোল-রাজগণ শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন দেশ জয় করে তাঁরা শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সাধন করে রাজ্যে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৬ খৃঃ) শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। নৌবাহিনী গঠন করে লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ সিংহল জয় করে তিনি চোল রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১৬-১০৪৪ খৃঃ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। নৌশক্তির বলে তিনি সমগ্র ভারত মহাসাগরে তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। সমুদ্রপথে রাজ্য বিস্তারই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য জয় করে, মালয়, সুমাত্রা ও জাভায় তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাংলার রাজা মহীপালকে পরাজিত করে তিনি গঙ্গা নদী পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন ও 'গঙ্গাইকোণ্ডা' বা 'গঙ্গা-বিজেতা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্য জয় অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনেই চোলদের কৃতিত্ব বেশী দেখা যায়। এই সময় চীন দেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। আরব ব্যবসায়ীগণ দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কেরল, পাণ্ড্য, সিংহল প্রভৃতি দেশ আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান ছিল। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর

অধিকার লাভ করাই রাজেন্দ্র চোলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তামিল, অন্ধ্র, কর্ণাটের কতক অংশ, সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি জয় করে তিনি দক্ষিণ উপকূলের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। চোল রাজদের বাণিজ্য জাহাজ, নানা বাণিজ্য দ্রব্য নিয়ে শ্রীবিজয় রাজ্য, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি রাজ্যে যাতায়াত করত। রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর কুলোত্তুঙ্গ (১০৭২-১১২২ খৃঃ) এই রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে চীনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একদল ভারতীয় ব্যবসায়ীকে চীন সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হোয়সাল ও পাণ্ড্য রাজ্যের আক্রমণের ফলে চোলরাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। মধ্য যুগের ইতিহাসে চোলদের নৌশক্তির বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্য কোন দেশে এই সময় এমন নৌশক্তি ছিল না।

অনুশীলনী

১। হূণ জাতির লোকদের বাসস্থান কোথায় ছিল? ভারতে হূণ আক্রমণের বিষয়ে যা জান লিখ।

২। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল? হর্ষবর্ধন কোন্ সময় সিংহাসন আরোহণ করেন? তাঁর রাজত্বকালে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হয়েছিল?

৩। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হতে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি?

৪। নালন্দা কোথায় ছিল? নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।

৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী কিরূপ ছিল? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। রাজপুত জাতি কারা? রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে কি জান? ভারতের বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলির বিবরণ দাও।

৭। পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিযোগিতার ধারা বিষয়ে আলোকপাত কর।

৮। কনৌজের সিংহাসন দখল নিয়ে পাল ও প্রতিহার বংশের রাজাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিযোগিতা চলেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। রাজা শশাঙ্ক কোন্ সময় বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন? তাঁর রাজ্য বিস্তার এবং শাসন-প্রণালী বিষয়ে যা জান লিখ।

১০। পাল এবং সেন যুগে বাঙালীর সমাজ কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১১। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ কেমন ছিল? আলোচনা কর।

১২। বাদামীর চালুক্য এবং কাঞ্চির পল্লব রাজবংশ দক্ষিণ ভারতে কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল? এই দুই রাজবংশ বিষয়ে যা জান বল।

১৩। দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে চালুক্য ও পল্লবদের অবদানের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৪। চোল রাজবংশের নৌশক্তির বিকাশ সম্পর্কে বিবরণ দাও।

১৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) স্কন্দগুপ্ত কে ছিলেন?
(খ) গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?
(গ) হর্ষবর্ধনের দানশীলতা বিষয়ে কি জান?
(ঘ) শীলভদ্র কে ছিলেন?
(ঙ) "রাজপুত" যুগ কাকে বলে?
(চ) রাজ্যশ্রী কে ছিলেন? তাঁর বিষয়ে কি জান?
(ছ) বল্লালসেন কোন্ বিশেষ প্রথা প্রচলন করেছিলেন?
(জ) "গীতগোবিন্দ" কে রচনা করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?
(ঝ) বিক্রমশীলা কি ও কোথায় অবস্থিত ছিল?

১৬। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) কনৌজের রাজা——সাথে রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়েছিল।
(খ) হিউয়েন সাঙ ভারতে প্রায়——বছর ছিলেন।
(গ) ——ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা।
(ঘ) রাষ্ট্রকূট রাজ্য——অবস্থিত ছিল।
(ঙ) সন্ধ্যাকর নন্দী——নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন।
(চ) মহাপণ্ডিত——বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।
(ছ) সিংহবিষ্ণুর পুত্র——পল্লব রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলেন।
(জ) কাঞ্চিনগরের কৈলাসনাথ শিবমন্দির—রাজাদের সময় নির্মিত হয়েছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়	বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের যোগযোগ চীনদেশ ও তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

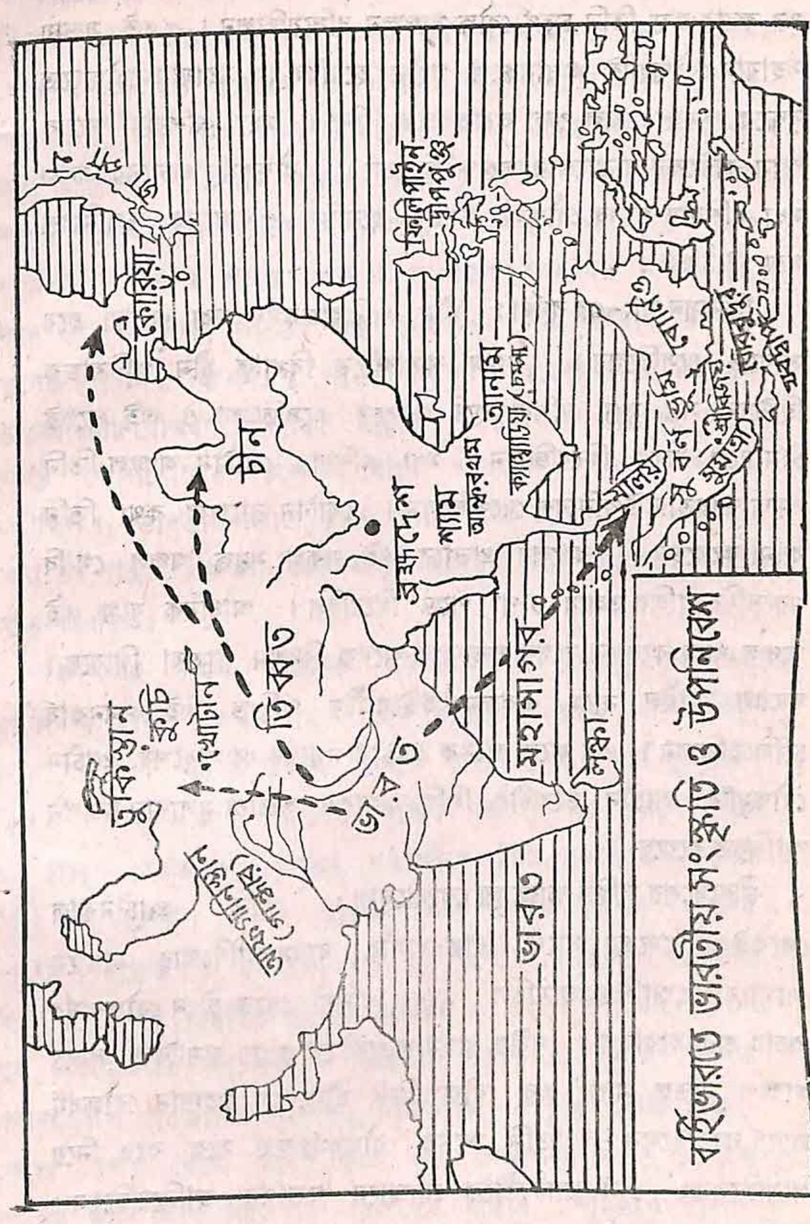
মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ ঃ প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে ভারতবাসী অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্য, চীন, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশের সাথে প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতবাসী ব্যবসা করত। ধর্মপ্রচার ও উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য লোকদের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম-প্রচারের জন্য স্থল ও জল উভয় পথই ব্যবহার করা হত। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ইন্দোচীন, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশের সাথে জলপথে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই এশিয়ার নানা দেশের সাথে ভারতবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মৌর্য সম্রাটদের সময়ই পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। তক্ষশিলা থেকে কাবুল ও আফগানিস্তান হয়ে চীনদেশে যাওয়ার পথ ছিল। চীনদেশ থেকে রেশম আমদানী করা হত ; ভারত থেকে মশলা, হাতীর দাঁত ও আরও অনেক জিনিস রপ্তানি করা হত। এই পথকে রেশম পথ (Silk Route) বলা হত।

মধ্য এশিয়া ঃ তুর্কীস্থান বা সমরখন্দ, তাসখন্দ, খোটান, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি দেশকেই মধ্য এশিয়া বলা হয়। এই অঞ্চল কাশ-গড়িয়া নামেও পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঃ মৌর্য সম্রাট অশোকই সবচেয়ে আগে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কুষাণ

সম্রাট কণিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধন পৃথিবীর নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের



বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও উপনিবেশ

ব্যবস্থা করেছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কই মধ্য এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেছিলেন। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মে

হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধমতের বিরোধ চলছিল। বৌদ্ধধর্মের মতভেদ দূর করার জন্য তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন বসিয়েছিলেন। এই সভায় মহাযান বৌদ্ধধর্মই প্রধানরূপে গৃহীত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধমতে বুদ্ধকে অবতার বলে পূজা করার প্রথা ছিল। মধ্য এশিয়ার অনেক স্থান কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে মধ্য এশিয়ায় অনেক বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়েছিল ও অনেক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা ঃ চীন পরিব্রাজকগণ মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে এসেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে এসেছিলেন ও এই পথেই চীনদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে তিনি সমৃদ্ধ ভারতীয় উপনিবেশ দেখেছিলেন। খোটান রাজ্যের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। কালের প্রভাবে এই সকল সমৃদ্ধ অঞ্চল গোবি মরুভূমির বালির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে এই অঞ্চল খনন করে সে যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অরেল স্টাইন নামে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই খননকার্য চালিয়েছিলেন। এর ফলে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি, প্রাচীন ভারতীয় লিপি, আরও অন্যান্য মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

চীনদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনদেশের সাথে ভারতবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়া থেকে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাটদের সময়ে কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে এক বৌদ্ধপণ্ডিত চীনদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি অনেক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। চীন সম্রাট তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আরও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতবর্ষ থেকে চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব,

কাশ্মীরের রাজা গুণবর্দ্ধন, বৌদ্ধ পণ্ডিত পরমার্থ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩৭৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, ও বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই সময় চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থগুলির অনুবাদও করা হয়েছিল। চীনা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি অনুবাদ করার জন্যও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে চীনদেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার জন্য বহু ছাত্রও সে সময় ভারতে শিক্ষা লাভের জন্য আসত। চীনা ভাষায় এখনও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। চীনদেশ থেকে জাপান ও কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। ভারতীয় সঙ্গীত চীনে সমাদর লাভ করেছিল। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলনও চীনদেশে প্রসার লাভ করেছিল।

তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঃ তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী দেশ। এখানকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভারত থেকে তিব্বতে যাতায়াতের পথও খুব দুর্গম ছিল। এই দুর্গম পথ পার হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ তিব্বতে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা ছিলেন স্ট্রং সান গাম্পো। তাঁর রাজত্বকালেই তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তিব্বতে ভারতীয় লিপি বা লেখার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম খুব প্রসার লাভ করেছিল ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তিব্বতে সমাদর লাভ করেছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে তিব্বত থেকে অনেক ছাত্র এসে লেখাপড়া শিখত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করত। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিরক্ষিত দু'বার তিব্বতে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারের জন্য তাঁকে তিব্বতে যেতে

হয়েছিল। বাংলার পাল বংশের রাজাদের সময় তিব্বতের সাথে ভারতের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে তিব্বতের রাজধানী লাসায় একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের মহান এক ব্রত নিয়ে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে পাড়ি দিয়েছিলেন।

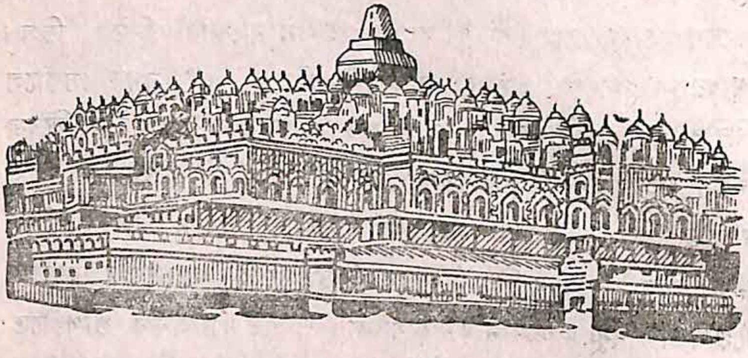
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তারঃ সুবর্ণভূমি ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ইন্দোচীন, যবদ্বীপ (জাভা), মালয়, বলিদ্বীপ, বর্ণিও সুমাত্রা প্রভৃতি দেশগুলিকেই 'সুবর্ণভূমি' বলা হতো। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক) সেকালে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এই বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে সমুদ্রপথে ভারতবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। এই ব্যবসা খুব লাভজনক ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি খুব সমৃদ্ধ ও ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণে এই দেশগুলিকে সুবর্ণভূমি বলা হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে এই সব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল, ও ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কম্বোজ রাজ্য ঃ ইন্দোচীনে প্রাচীন কম্বোজ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমান কম্বোডিয়া, শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডেই প্রাচীন কম্বোজ রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে কৌণ্ডিন্য নামে একজন ভারতবাসী নাগ-রাজকুমারী সোমাকে বিয়ে করে এখানে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীন দেশের লোকেরা এই রাজ্যের নাম দিয়েছিল ফুনান। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজে স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও প্রায় নয় শ' বছর ধরে এখানে এই রাজবংশ রাজত্ব চালিয়েছিল। এই বংশের রাজাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়

জয়বর্দ্ধন, যশোবর্মন ও দ্বিতীয় সুবর্ণবর্মনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কম্বোডিয়া কোচিন-চীন, লাওস শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের কতক অংশ এই সাম্রাজ্যের ভিতর ছিল। যশোধরপুর কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগর সেকালে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই নগর চতুষ্কোণ ছিল; প্রত্যেক দিকের সীমানা দুই মাইল বিস্তৃত ছিল এবং চারদিক্ উঁচু প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। নগরের মধ্যস্থলে বিখ্যাত 'বেয়ন' শিব মন্দির স্থাপিত ছিল। বেয়ন শিব মন্দিরের কিছু দূরেই কম্বোজের বিখ্যাত আঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এত বড় মন্দির পৃথিবীতে আর নেই বললেই হয়। এই মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প অতুলনীয়। নানা দেব-দেবীর মূর্তি ও পুরাণের নানা কাহিনী মন্দিরের গায়ে আঁকা হয়েছে। আঙ্কোরথম প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানকার রাজাগণ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

মালয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য: খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয়, জাভা, বালি, বর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও ছিল। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে এখানকার সম্রাটগণ চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য জয় করেছিলেন। শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থক ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারঘোষ ছিলেন তাঁদের কুলগুরু। তাঁর আদেশে এই রাজ্যে তারার মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। চীনদেশের সাথে শৈলেন্দ্র সম্রাটদের যোগাযোগ ছিল। বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির শৈলেন্দ্র সম্রাটদের অপূর্ব কীর্তি। বিরাট আয়তনবিশিষ্ট এই মন্দিরের গায়ে নানা বৌদ্ধ মূর্তি আঁকা হয়েছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অমূল্য নিদর্শনরূপেও এই মন্দির বিখ্যাত। সুমাত্রায় হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল চতুর্থ শতাব্দীতে। এই রাজ্যের নাম শ্রীবিজয় রাজ্য। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রসার লাভ করেছিল। যবদ্বীপ বা জাভায়ও হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠেছিল প্রায় একই সময়ে। বহুদিন

পর্যন্ত এই রাজ্য শৈলেন্দ্র সম্রাটদের অধীনে ছিল। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য পতনের পর রাজা বিজয় এখানে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করে-



বরবুদুরের স্তূপ

ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তিক্ত-বিল্ব বা মজপহিত নগরে। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানগণ এই রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সমগ্র অঞ্চলে ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি প্রসার লাভ করেছিল। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কলাকৌশলও এখানে অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় ভাবধারার বিকাশের ফলে এখানে এক বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কম্বোজ ও চম্পা রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারই হয়েছিল মূখ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও এই দেবতাদের উপাসনা করা হত। কম্বোজ রাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করতেন; দেব-দেবীর পূজা ও বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের চর্চা এঁদের কাজ ছিল। বিভিন্ন মন্দিরে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করা হত। চম্পা রাজ্যেও অনেক দেব-মন্দির নির্মিত হয়েছিল। জাভা ও বালিতে ভারতীয় নৃত্যের প্রচলন এখনও দেখা যায়। কম্বোজ রাজ্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে ভারতীয় শিল্পের

সুস্পষ্ট ছাপ আছে। বেয়ন ও আঙ্কোরভাট মন্দিরের ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বেয়ন শিব মন্দিরের চল্লিশটি গম্বুজের চূড়ায় শিবের ধ্যানরত অবস্থার মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালও নানা দেব-দেবীর চিত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

মালয়ের শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যবদ্বীপের বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির ভারতীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ অবদান। এই মন্দিরকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়ে থাকে। বরবুদুরের কাছে প্রামবানাম্ মন্দিরের শিল্পকলাও প্রশংসনীয়। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অঙ্কিত আছে। শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ বিদ্যাচর্চারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈলেন্দ্র-রাজ বলপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সংস্কৃত, পালি ও তামিল ভাষার সাথে এখানকার ভাষা মিলিত হয়ে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। এই নূতন ভাষায় অনেক ভারতীয় পুস্তকের অনুবাদও করা হয়েছিল। ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, নাচ-গান সবই এখানকার লোকেরা অনুকরণ করেছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রায় পনের শ' বছর ধরে টিকেছিল।

অনুশীলনী

১। মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা আলোচনা কর।

২। বৃহত্তর ভারত বলতে কি বোঝ? এশিয়ার নানা দেশের সাথে বৃহত্তর ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল?

৩। মধ্য এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্পর্কে কি জান?

৪। হিউয়েন সাং-এর বিবরণী হতে আমরা মধ্যযুগের ভারত সম্পর্কে কি জানতে পারি?

৫। চীন ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৬। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে কি বোঝ? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ কি ভাবে বিস্তার লাভ করেছিলন সংক্ষেপে বল।

৭। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :

(ক) "মধ্য এশিয়া" বলতে আমরা কি বুঝি ?

(খ) খোটান রাজ্য কি ?

(গ) কাশ্যপ মাতঙ্গ কে ছিলেন ?

(ঘ) স্ত্রং-সান্-গাম্পো কে ছিলেন ?

(ঙ) "সুবর্ণভূমি" কাকে বলে ?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) যশোধরপুর—রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(খ) ——প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(গ) আঙ্কোরভাট একটি বিখ্যাত——মন্দির।

(ঘ) বরবুদুর একটি বিখ্যাত ——মন্দির।

(ঙ) চম্পা ছিল একটি প্রাচীন——রাজ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী আমল
(১২০৬—১৫২৬ খৃষ্টাব্দ)
তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য
সুলতানী আমলে ভারতের অবস্থা
সুলতানী আমলে বাংলাদেশ

তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য

তুর্কী-আফগানদের ভারত আগমন : খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই তুর্কী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আরব খলিফাগণ ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে এঁরা সিন্ধুদেশ জয় করেন। ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে আলপ্তিগিন নামে এক তুর্কী বীর আফগানিস্তানের গজনীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আলপ্তিগিনের পৌত্র সুলতান মামুদ ধনরত্নের লোভে ১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সতেরো বার ভারতের নানা স্থানে লুণ্ঠন করেন। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে ঘোর বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন গজনী রাজ্য দখল করেন।

স্থায়ীভাবে ভারতে রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ভারতের ধনসম্পদ, বিশেষ করে সিন্ধু নদের উপত্যকার উর্বর অঞ্চলে তিনি রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া বিধর্মী ও পৌত্তলিক হিন্দুদের পরাজিত করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা মুসলমানগণ পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

এই সময় চৌহান বংশের রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীর অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী তুর্কীদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ঘোরীকে পরাজিত করেন। পরের বছর মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। কুতুবুদ্দিন নামে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে ভারত শাসনের ভার দিয়ে মহম্মদ ঘোরী দেশে ফিরে যান।

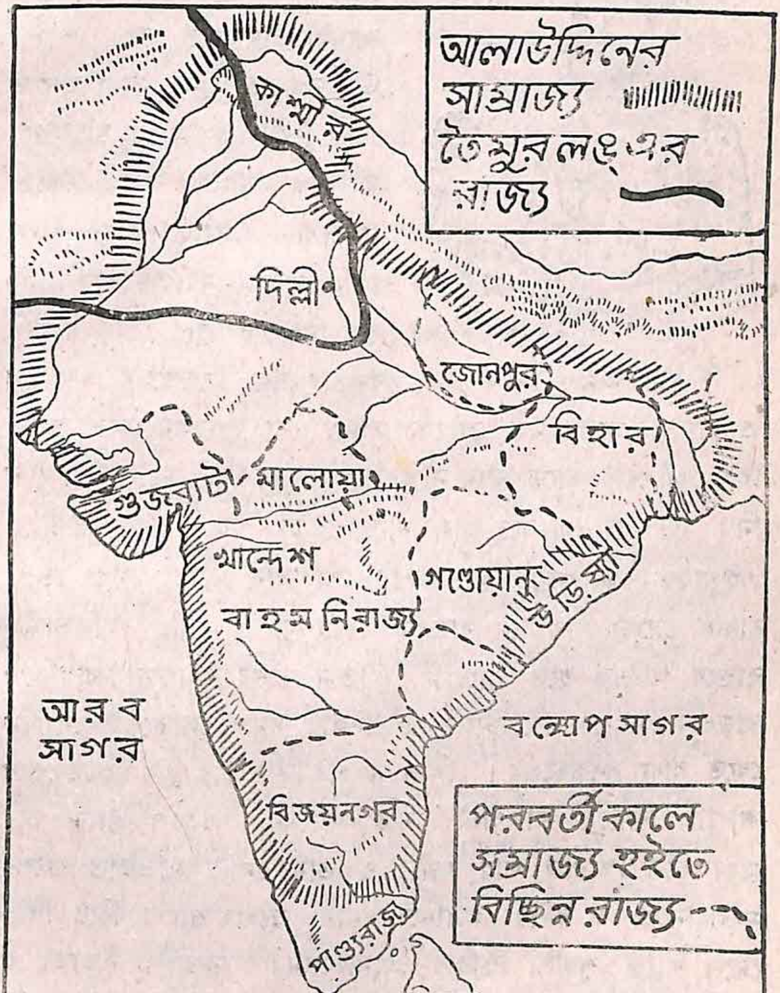
দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : ১২০৬ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতানদের সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে স্বাধীন

সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবুদ্দিন ও এই বংশের সুলতানগণ অনেকেই ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই বংশকে 'দাসবংশ' বলা হয়। কুতুবদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা ইলতুতমিস (১২১১-১২১৬ খৃঃ) দিল্লীর সুলতান হন। উনি সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন ও সাম্রাজ্যের আয়তনও অনেক বাড়িয়েছিলেন। এই সময় মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খাঁ ভারতের সীমান্তে এসে পড়েছিলেন। ইলতুতমিস চেঙ্গিসের শত্রুকে আশ্রয় না দিয়ে কৌশলে মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিলেন। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা রাজিয়া (১২৩৬-৪০ খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। রাজোচিত নানা গুণ থাকা সত্বেও শুধু নারী বলেই দিল্লীর ওমরাহগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও তাঁদের হাতে রাজিয়া নিহত হন। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন বলবন নামে এক মন্ত্রী দিল্লীর সিংহাসন দখল করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তুঘ্রিল খাঁকে পরাজিত করে তিনি বাংলাদেশেও সুলতানী শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। বলবনের পুত্র কায়কোবাদের সময়ে আবার দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। কায়কোবাদকে হত্যা করে জালালুদ্দিন খলজী (১২৯০ খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসন দখল করে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি রাজ্য জয় করেন। বহু ধনরত্ন দিয়ে দেবগিরিরাজ আলাউদ্দিনের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। রাজধানীতে ফিরে এসে আলাউদ্দিন পিতৃব্যকে হত্যা করে নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন (১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।


আলাউদ্দিন খলজী

সমগ্র ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেছিলেন ও তাঁর সেনাপতি মালিক

কাফুর মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য পর্যন্ত জয় করে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৩১৬ খৃঃ) পর



দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে ১৩২০ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন দখল করে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ জুনা খাঁ মহম্মদ বিন তুঘলক

নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হলেও খাম-খেয়ালী স্বভাবের ফলে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আলা-উদ্দিনের মত তিনিও সারা ভারতে রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়ার খোরাসান রাজ্য জয় করার স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। এই অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি দেশের করভার বৃদ্ধি করেছিলেন এবং চীন ও পারস্য দেশের মত ভারতে তামার নোট প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এই নোট যাতে জাল না হতে পারে তার কোন ব্যবস্থা করেন নি। এর ফলে বাজারে জাল নোটের প্রচলন হয় ও বাধ্য হয়ে তাঁকে এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে হয় ও তাঁর খোরাসান জয়ের স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়। দেশের মাঝখানে রাজধানী নিয়ে যাবার সখও এমনিভাবেই বাস্তবে পরিণত হতে পারে নি। তিনি দেশের মধ্যস্থল দেবগিরিতে রাজধানী সরাতে চেয়েছিলেন ও দিল্লীর সমস্ত লোককেই সেখানে যেতে বাধ্য করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে আসেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ফিরোজ শাহ্ দিল্লীর সুলতান হন। অভিজাত বংশের মুসলমানদের ও ধর্মীয় প্রধানদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মামুদ তুঘলকের সময় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে বীর তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লীর সুলতান পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হন। তিন মাস ধরে ভারতে অত্যাচার চালিয়ে তৈমুর ভারত ছেড়ে চলে যান। তিনি খিজির খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে



মহম্মদ বিন তুঘলক

ছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার করে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈমুরের প্রতিনিধি হিসাবে সৈয়দ বংশের সুলতানগণ ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিলেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহকে পরাজিত করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন ও লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লোদী বংশের সুলতানগণ আফগান ছিলেন লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে টিকতে না পেরে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের সুলতান বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান। বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। এর ফলে ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

সুলতানী আমলে ভারতের অবস্থা

রাজনৈতিক জীবন ঃ তুর্কী-আফগান সুলতানগণ ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। মুসলমান ধর্মগুরু খলিফাই ছিলেন ইসলাম জগতের প্রধান। নীতিগত ভাবে ভারতের সুলতানগণ খলিফার প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করতেন ; কিন্তু কার্যতঃ সুলতানই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা, সামরিক শক্তির উপরই তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনিই ছিলেন প্রধান সেনাপতি, সর্বশেষ বিচারক ও আইন-প্রণেতা। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে তাঁর একটি পরামর্শ সভা বা মজলিস-ই খালওয়াৎ ছিল। রাজ্যে সুশাসনের জন্য কতকগুলি বিভাগ ছিল। রাজস্ব বিভাগের কর্তাকে ওয়াজীর বা প্রধান মন্ত্রী বলা হত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকর্মচারী ছিলেন। সামরিক বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, প্রভৃতি উপযুক্ত রাজকর্মচারীদের হাতে থাকত। বিচার বিভাগের প্রধানকে কাজী-উল-কাজাৎ বলা হত ; মফ্‌তিগণ কোরাণের ব্যাখ্যা করে কাজীকে সাহায্য করতেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল কোটোয়ালের উপর। গ্রামের শাসন ও বিচারের ভার ছিল

গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর। সমগ্র রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা হত।

সামাজিক জীবন ঃ ভারতের সমাজে সে যুগে দুই শ্রেণীর লোক ছিল—বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দুগণ। মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন মুসলমান ও ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। ক্রীতদাসের জীবন ঘৃণা বা অবহেলায় পরিপূর্ণ বলে মনে করা হত না। সুলতান, আমীর, ওমরাহ, উচ্চ-রাজকর্মচারীগণ বিলাসব্যসন ও আরামে দিন কাটাতেন। লেখক, চিকিৎসক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীগণের জীবনযাত্রা খুব খারাপ বলা যায় না। চাষী, মজুর, ছোট শিল্পীগণ কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। দেশে পূজা পার্বণ, পশুবলি, নৃত্যগীত, গ্রাম্যমেলা প্রভৃতির প্রচলনও ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ সুলতানী আমলে ভারত ধনসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। কৃষিই ছিল ভারতবাসীর জীবিকা। অনেক সুলতানও কৃষি-কাজের নানা উন্নতি বিধান করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত খুব উন্নত ছিল। চীন, পারস্য, ইউরোপ, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। শিল্পেও ভারত সে সময় খুব উন্নত ছিল। তুলা ও রেশম বস্ত্র বয়ন শিল্পের খুব উন্নতি হয়েছিল।

হিন্দু ও ইসলাম দুই ধর্মের পরস্পরের উপর প্রভাব ঃ সুলতানী যুগে ভারতে মুসলমান ধর্মের প্রসার ঘটেছিল! এই দুই ধর্মই পরস্পরকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছিল। মুসলমান যুগের প্রথম দিকে হিন্দুগণ মুসলমানদের থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। তাই মাধবাচার্য, রঘুনন্দন শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্মে নানা রক্ষণশীল সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাছাকাছি বাস করার ফলেও অনেক অনুন্নত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে হিন্দু ধর্মেও অনেক সংস্কার সাধিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম অনেক উদার হয়েছিল। জাতিভেদ ও বর্ণভেদের কঠোরতা অনেক কমে গিয়েছিল। হিন্দু ও

মুসলমান ধর্মসংস্কারকগণ দুই ধর্মের পরস্পর সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন এবং এই চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল।

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদারতা ঃ দিল্লীর মুসলমান সুলতানগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মন্দির, মসজিদ, সমাধি, মন্দির প্রভৃতি হিন্দু শিল্পীরাই নির্মাণ করতেন। এর ফলে হিন্দু শিল্পরীতির সাথে ইসলামিক শিল্পরীতির মিলন ঘটেছিল ও ভারতে ইন্দো-ইসলামিক শিল্প পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু মন্দিরের উপর গম্বুজ ও মুসলমান সমাধির উপর কলস ও পদ্ম এখন অনেক স্থানে দেখা যায়। দিল্লীর কুতুবমিনার, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও বিজাপুরের গোল গম্বুজ সে যুগের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কাব্য সাহিত্যের অনুবাদ ঃ সুলতানী যুগে সংস্কৃত ভাষার অনেক গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। ভাগবত ও পদ্মপুরাণের অনুবাদও সুলতানী যুগেই হয়েছিল।

ভক্তিবাদ (মধ্যযুগের সাধুগণ) ঃ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে ধর্মের ক্ষেত্রে উদার মতবাদের প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়ে ভারতে অনেক ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল। এক ঈশ্বরের উপাসনা, অন্তরের পবিত্রতা, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম ও ভালবাসা ভক্তিবাদের মূল কথা। সঙ্কীর্ণতা, জাতি ও বর্ণভেদের কঠোরতা প্রভৃতি দূর করে সকলেরই ঈশ্বর উপাসনার অধিকার স্থাপন ধর্ম-সংস্কারকদের উদ্দেশ্য ছিল। রামানন্দ, কবীর, নানক, একনাথ প্রমুখ ভক্তিধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন



শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বাল্যকাল

থেকেই তাঁর ধর্মানুরাগ ছিল। নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ২৪ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস, ঈশ্বরের নামগানই মুক্তির উপায়—এই ছিল তাঁর উপদেশ। ভারতের নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করে শেষ জীবনে পুরীর কাছে নীলাচলে গিয়ে তিনি বাস করেছিলেন ও সেখানেই ৪৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যের বাণী বাংলায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খৃঃ) ঃ লাহোরের কাছে তালবন্দী গ্রামে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্ম হয়েছিল। সংসার ত্যাগ করে ইনি সুফীধর্মের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু পরে এই ধর্ম ত্যাগ করে নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। মুসলমান তীর্থ মক্কায়ও তিনি গিয়েছিলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি শিখ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অন্তরের পবিত্রতা ও ভগবানের উপাসনা শিখ ধর্মের মূল কথা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক লোক তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছিল। 'গ্রন্থসাহেব' পুস্তকে নানকের উপদেশ লেখা আছে।



নানক



কবীর

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ) ঃ কথিত আছে কবীর ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। শৈশবে এক মুসলমান তাঁতী তাঁকে লালন-পালন করেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক রামানন্দ তাঁর গুরু ছিলেন। হিন্দু

ও মুসলমান ধর্মে মিলনের চেষ্টা তাঁর প্রচারের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দুর 'রাম' ও মুসলমানের 'আল্লা' এক ; ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান, ঈশ্বরের নাম ও অন্তরের পবিত্রতা ঈশ্বর লাভের উপায়—এই ছিল তাঁর উপদেশ। হিন্দি ভাষায় পদ বা দোঁহা রচনা করে তিনি তাঁর উপদেশ প্রচার করেছিলেন।

সুলতানী আমলে বাংলাদেশ

১২০২ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খলজী গৌড় আক্রমণ করে বাংলায় মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বাংলায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। সুলতান কুতুবুদ্দিনের রাজত্বকালে আলিমর্দন (১২১০ খৃঃ) নামে এক ব্যক্তি বাংলায় স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইলতুৎমিস তাঁকে পরাজিত করে নিজ পুত্র নাসিরুদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন বলবন তুঘ্রিল খাঁকে পরাজিত করে নিজ পুত্র বঘরা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় বাংলার সুলতানগণ আবার স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে শামসুদ্দিন নামে এক মুসলমান 'ইলিয়াস-শাহ' উপাধি নিয়ে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেন। তিনিই ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ত্রিহুত, সোনারগাঁ ও কামরূপ জয় করে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁকে দমন করার জন্য বাংলা অভিযান (১৩৫৩ খৃঃ) করেন, কিন্তু তিনি বিফল হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯ খৃঃ) বাংলার সুলতান হন। তিনিও পিতার ন্যায় সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময় ফিরোজ তুঘলক আবার বাংলা আক্রমণ করেন ; কিন্তু সিকন্দর শাহ বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৩৮৯ থেকে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন। আজম শাহের পুত্র হামজা শাহের রাজত্বকালে দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন। কিছুকাল পরে তিনি নিজ পুত্র যতুর হাতে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করেন। যতু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। জালালুদ্দিনের পুত্র শামসুদ্দিন আহম্মদের সময় দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় ও পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের হাতে রাজ্যের শাসনভার ফিরে যায়। কিন্তু ইলিয়াস শাহী বংশের শেষের দিকে বাংলায় আবার অরাজকতা দেখা দেয় ও বাংলার অভিজাত বংশের লোকেরা আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে বাংলার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) রাজত্বকালকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা যায়। তিনি সুদক্ষ ও জনপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। উত্তর বিহার ও উড়িষ্যা জয় করে তিনি রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে হুসেন শাহ বিখ্যাত ছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খৃঃ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার ন্যায় সুশাসক ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় বাবর ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নসরৎ শাহ বাবরের সাথে মিত্রতা করে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে ছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়।

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে ও ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলার সমাজে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের কঠোরতা ছিল; কৌলীন্য প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও বৈশ্যগণ উচ্চ বর্ণের লোক বলে বিবেচিত হতেন, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় শূদ্র ছিলেন। ব্রাহ্মণগণই সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতেন। পূজা, শাস্ত্র পাঠ, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি তাঁদের কাজ ছিল। স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা ও পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

হুসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের কঠোরতা কমে গিয়েছিল। মুসলমান ধর্ম প্রচারের ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হুসেন শাহ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ দেখতেন না। এই সময় অনেক শিক্ষিত হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ও জায়গীর লাভ করেছিলেন। হিন্দুদের অনেক আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করেছিল।

সাংস্কৃতিক ঃ সুলতানী আমলে বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (১৩৭০-১৪৬০ খৃঃ) বৈষ্ণব পদাবলী লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাংলার বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস (১৪১৭-৭৭ খৃঃ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন। হরিহর দত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখ কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্য লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ এই সময় বাংলা কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। বাংলা দেশের মতো সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য ভারতের অন্য কোন স্থানে পাওয়া যেত না। বাংলায় বয়ন শিল্প গৌরবের বিষয় ছিল। এখানকার তুলা ও রেশম উভয় প্রকার বস্ত্র বিদেশে চালান যেত। তা ছাড়া খাদ্যশস্য, চিনি, আদা প্রভৃতিও বিদেশে রপ্তানি হত। দেশের ধন-সম্পদ অভিজাত শ্রেণীর জমিদার, ওমরাহ ও রাজকর্মচারীগণ ভোগ করতেন। জনসাধারণের জীবন করভারে জর্জরিত ছিল। চাষী, মজুর ও ছোট শিল্পীগণ কোন উপায়ে দু বেলা অন্নের সংস্থান করতেন।

অনুশীলনী

১। তুর্কী-আফগানদের ভারতে আগমনের ঘটনাটি আলোচনা কর। এদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পদ্ধতির বিবরণ দাও।

২। কুতুবুদ্দিন কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?

৩। খলজী বংশ ও তুঘলক বংশ দিল্লীর সিংহাসন কি ভাবে দখল ও শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন তার বিবরণ দাও।

৪। সুলতানী আমলে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল আলোচনা কর।

৫। সুলতানী আমলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল? কাব্য-সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে কি ভাব পরিলক্ষিত হয়?

৬। সুলতানী আমলে বাংলা দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক জীবনের বিবরণ দাও।

৭। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:

(ক) খলজী রাজবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(খ) তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ কোন্ সময় হয়েছিল?

(গ) শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচারের বিষয় কি জান?

(ঘ) কবীর সম্পর্কে বিবরণ দাও।

(ঙ) নানক কে ছিলেন? তিনি কোন্ ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

(চ) মহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে কি জান?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ——দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(খ) ——ভারতে সর্বপ্রথম তামার নোট প্রচলন করেছিলেন।

(গ) বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে——কে পরাজিত করেন।

(ঘ) মিথিলার কবি বিদ্যাপতি——সাহিত্যের উন্নতি করেছিলেন।

(ঙ) আদিনা মসজিদ——অবস্থিত।

(চ) ——ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়	মধ্যযুগের শেষ পর্ব (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী) রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য নূতন ভাবধারার বিকাশ পুরাতন বনাম নূতন যুগ

রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ মধ্যযুগের শেষ পর্ব বলতে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকে বোঝায়। এই সময় ইউরোপের জাতীয় জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন প্রেরণা এসেছিল। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল ; বিশেষ করে ফ্রান্সের সাহিত্য, ইংলণ্ডের নাটক ও কবিতা এবং জার্মানীর সংগীতবিদ্যা বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। এক নূতন ভাবধারার প্রসার সাধন করে জগতে নূতন আলোকের সন্ধান এনেছিল। এই নূতন ভাবধারাকে রেনেসাঁস ও এই সময়কে রেনেসাঁসের যুগ বলা হয়।

রেনেসাঁসের উপর কনষ্টান্টিনোপলের পতনের প্রভাবঃ বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বহুদিন ধরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদ কনষ্টান্টিনোপল জয় করে এখানকার প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখানকার পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বইগুলি নিয়ে ইতালীতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ইতালী সে সময় উন্নত ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল ; এখানকার জীবনযাত্রাও শান্তিপূর্ণ ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের জ্ঞানীগণ ইতালীতে এসে আবার তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। ইতালীয় শিক্ষাবিদ্‌গণও এঁদের সাথে যোগ দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারসাধনে সচেষ্ট হতে লাগলেন। ইতালীকে তাই রেনেসাঁসের জন্মস্থান বলা হয়ে থাকে। মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ছিল না। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে

উঠেছিল। কিন্তু এই সময়ের শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য : কোন যুক্তি বা সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া রেনেসাঁসের যুগের পণ্ডিতগণের রীতিবিরুদ্ধ ছিল। অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানলাভের জন্য বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা ছিল তাঁদের পদ্ধতি। পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস অভ্রান্ত বলে তাঁরা গ্রহণ করতে চাইতেন না। ইউরোপের বাইরের অন্যান্য দেশ আবিষ্কারের চেষ্টা রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষের মর্যাদাবোধ ও বর্তমান জীবনকে সম্যকভাবে উপভোগ করা রেনেসাঁসের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। কনষ্টান্টিনোপলে পাওয়া বাইবেলের গ্রীক অনুবাদে এই মতবাদের সমর্থন ছিল। বাইবেলের অনুশাসন ও ধর্মযাজকদের উপদেশের উপর নির্ভর করে না থেকে রেনেসাঁসের যুগের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবনের নূতন মূল্যায়ন করেছিলেন। নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ মানবতাবাদী বা হিউম্যানিষ্ট নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ রেনেসাঁস সে যুগের মানুষকে দিয়েছিল নূতন চেতনা, নূতন স্বাধীনতা, নূতন প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস। এর ফলে সারা ইউরোপে নূতন ভাষা, নূতন শিল্পরীতি, নূতন শিক্ষা পদ্ধতি ও নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা নূতন জ্ঞান লাভের বিশেষ পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল।

নূতন ভাবধারার বিকাশ : সাহিত্য, শিল্প, ভৌগোলিক আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সকল বিষয়েই নূতন ভাবধারার বিকাশ সাধিত হয়েছিল। ইতালীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে দান্তে, পেট্রাক ও বোক্কাচিও এবং ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে চসারের রচনা এই যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। চিত্রশিল্পে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ও র‍্যাফেলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাস প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবীর

আকৃতি গোলাকার, আর অন্যান্য গ্রহের সাথে পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে ঘোরে। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ভয়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রচার করতে পারেন নি। অনেক দিন পরে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ) এই সত্য প্রচার করেছিলেন। ধর্মযাজকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেও অনেক উন্নতি হয়েছিল। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটন নামে এক ইংরাজ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এর ফলে অল্প সময়ে ও কম খরচে বই ছাপা সম্ভব হয়েছিল; ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সাধিত হয়েছিল। রেনেসাঁসের সময়ে গোলা-বারুদের আবিষ্কার হয়েছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারঃ মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচ্যের চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে ইউরোপবাসীর কৌতূহল জেগেছিল। ফলে নৌবিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়। পর্তুগীজ নাবিক বার্থালোমিউডিয়াজ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। ভাস্কোডাগামাও ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে এসেছিলেন। স্পেনের রাজা ও রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় কলম্বাস ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। নূতন আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা দেশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবঃ রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপে অনেক নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় চার্চ গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের ফ্রান্সেই ফিউডাল প্রথার প্রসার সবচেয়ে বেশী ঘটেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের রাজশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ পার্লামেণ্টে ধর্মযাজক ও নোবলদের সাথে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সদস্য নিয়োগ করেছিলেন। শতবর্ষ যুদ্ধের পর ফ্রান্সের রাজার শক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। রাজা একাদশ লুই (১৪৬১-৮৩ খৃঃ) অনেক নূতন স্থান অধিকার করে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন।

অষ্টম চার্লস (১৪৮৩-১৪৯৩ খৃঃ) ব্যারনদের বিদ্রোহ দমন করে ফ্রান্সের সীমানা প্রায় বর্তমান ফ্রান্সের সমান করে ফেলেছিলেন। গোলাপের যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের নূতন রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর ল্যাংকাষ্টার ও ইয়র্ক বংশের গৃহবিবাদ মিটে গিয়েছিল ও ইংলণ্ড শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। রাজা সপ্তম হেনরী ব্যারনদের দমন করেছিলেন; টিউডার যুগে ইংলণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যর উন্নতি ঘটেছিল। এই সময় ইংলণ্ডে রেনোসাঁসের প্রভাব দেখা গিয়েছিল। মধ্যযুগে সমস্ত সাইবেরিয়ান অঞ্চল মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে পর্তুগাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পর্তুগালের রাজা জনের রাজত্বকালে এখানে রাজশক্তি বৃদ্ধি পায়; যুবরাজ হেনরী নৌবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁকে 'হেনরী দি নেভিগেটার' বলা হয়ে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল রাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নতি লাভ করেছিল। পর্তুগালের মত স্পেনও মুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্যাষ্টিল, অ্যারাগণ, সেভার ও গ্রানাডা নামে এখানে চারটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে অ্যারাগণ রাজ্যের রাজকুমার ফার্ডিন্যাণ্ড ক্যাষ্টিলের রাজকন্যা ইসাবেলাকে বিবাহ করে দুটি রাজ্যকে একত্রিত করেছিলেন। ফার্ডিন্যাণ্ড সুশাসক ছিলেন ও সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সময় কোন কোন দেশে নূতন চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস ফার্ডিন্যাণ্ডের পৌত্র ছিলেন। চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেনে শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ক্যাথলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হল্যাণ্ডের ডাচ্‌গণ স্পেনের অধীনে বাস করত। ডাচবাসীরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্রাট ফিলিপ এটা সহ্য করতে পারলেন না। ডাচ্‌দের শায়েস্তা করার জন্য তিনি ডিউক আলভা নামে এক অত্যাচারী শাসনকর্তাকে হল্যাণ্ডে পাঠালেন।

ডাচ্‌দের স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ডিউক আলভার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ডাচ্‌গণ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রিন্স উইলিয়ম নামে এক স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্পেন-রাজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হল্যাণ্ডে বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ডাচ্‌দের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করতে চেষ্টা করেছিলেন। নিরুপায় হয়ে ডাচ্‌গণ সমুদ্রের ধারের বাঁধগুলি কেটে সারা দেশ জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে স্পেন-রাজকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। ডাচ্‌দের স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানেই শেষ হয়নি। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স উইলিয়াম নিহত হন ও তাঁর পুত্র মরিস বীরত্বের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। মরিস স্পেনের সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা এনেছিলেন।

ইউরোপের বিস্তারঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাশিয়াতেও স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। নবম শতাব্দীতে স্লাভ্ জাতির লোকেরা এখানে কিয়েভে নামে একটি ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুর্কীদের আক্রমণের ফলে এই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়ার মস্কোভি রাজ্য গড়ে উঠে। এই রাজ্যের রাজা বীর ইভান (১৪৪৬-১৫০২ খৃঃ) তুর্কীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন ও 'জার' (Czar) উপাধি গ্রহণ করে রাশিয়ায় স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

পুরাতন বনাম নূতন যুগঃ বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ না থাকার ফলে মধ্যযুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ ছিল। দেশে ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত ছিল ও পোপের সম্মান খুব বেশী ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, পোপের প্রাধান্য অনেক কমে গিয়েছিল ও ইউরোপে অনেক জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষ পর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ শাসন ব্যাপারে নোবল ও ধর্মযাজক শ্রেণীর সাথে এঁরাও অধিকার লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণের

অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। সর্বসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও নজর দেওয়া হয় নি। দেশের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের হাত ছিল না ; কিন্তু জনসাধারণের উন্নতি ও অগ্রগতির সূচনা মধ্যযুগের শেষ পর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। ইংলণ্ডের কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে এই উন্নতির সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

ইংরাজ জাতির বিদ্রোহ বা কৃষক-বিদ্রোহ : ১৩৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্যাপক মহামারি দেখা দিয়েছিল। এর ফলে এখানে অনেক লোকের মৃত্যু হওয়ায় দেশে কৃষক ও মজুরের অভাব দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য চাষী ও মজুরগণ তাদের কাজের জন্য বেশী মজুরি দাবী করেছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বা আইনসভা এই দাবীকে অন্যায় বলে মনে করেছিল ও বেশী মজুরি দাবী করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে শ্রমিক আইন পাশ করা হয়েছিল। তা ছাড়া এই সময় ইংলণ্ডে মাথাপিছু কর বা পোল ট্যাক্স বসান হয়েছিল। ইংলণ্ডের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে জীবনযাত্রার ব্যয়ও যে খুব বেড়ে গিয়েছিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সে কথা চিন্তা করেন নি। কর-আদায়কারীদের অত্যাচারের ফলেই ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। কেণ্ট প্রদেশের প্রায় এক লক্ষ মানুষ অস্ত্রশস্ত্রসহ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। কৃষক-বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ইয়াট টাইলার নামে এক ব্যক্তি। জন বল নামে এক ধর্মযাজক কৃষকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কেণ্ট থেকে সশস্ত্র জনতা লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ; পথে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য ধনীব্যক্তিদের বাড়ী পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। ক্যাণ্টারবারীর আর্চ-বিশপ ও চান্সেলারের সম্পত্তি লুট করে তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজা খুব ভয় পেয়েছিলেন ও কৃষকদের সব দাবী পূরণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আশ্বাসের ফলে জনতা শান্ত হয়েছিল। সার্ফ প্রথার বিলোপ সাধন, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, পোল ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা, বিদ্রোহীদের কোন শাস্তি না দেওয়াই

কৃষকদের দাবী ছিল। ইংলণ্ডের রাজা বিদ্রোহের সময় সব দাবী মেনে নিলেও বিদ্রোহ শান্ত হয়ে গেলে অন্য মূর্তি ধারণ করেছিলেন। জন বল সহ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে এই সময় নোবল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যাই বেশী ছিল; তাঁরা ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাথে চাষী ও মজুর সম্প্রদায়ের লোকদের আইন সভায় সদস্য করার কথাও তাঁদের মনে হয়নি। কৃষক-বিদ্রোহ নিষ্ফল হলেও এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল—এর মধ্যে ভবিষ্যৎ শিল্পবিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সার্ফ ও ভিলেন প্রথা দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। 'রেনেসাঁস' বলতে কি বোঝ? রেনেসাঁসের উপর কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের প্রভাব কিরূপ?

২। রেনেসাঁসের যুগে কি কি নতুন ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল?

৩। রেনেসাঁসের যুগে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কি জান?

৪। ডাচদের জাতীয় সংগ্রাম কখন শুরু হয়েছিল? ফলাফল কি?

৫। কৃষক বিদ্রোহ কখন হয়েছিল? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য কি?

(খ) হিউম্যানিষ্ট বলতে কি বুঝ?

(গ) মুদ্রাযন্ত্র কে আবিষ্কার করেছিলেন?

(ঘ) জন বল সম্পর্কে কি জান?

(ঙ) কৃষক-বিদ্রোহের ফলাফল কি হয়েছিল?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) —কে রেনেসাঁসের জন্মস্থান বলা হয়ে থাকে।

(খ) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি একজন — ছিলেন।

(গ) যুবরাজ — নৌবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(ঘ) — শতাব্দীর শেষে সার্ফ ও ভিলেন প্রথা দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল।

(ঙ) — নামে এক ইংরাজ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন।